অন্তরঙ্গ চীন

দেবব্রত বিশ্বাস

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ANTARANGA CHIN

by Debabrata Biswas

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৫৮

প্রকাশক

অবনীরঞ্জন রায়
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

এন. সি. শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ. তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
খালেদ চৌধুরী

আমার কৈফিয়ৎ

ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে ১৯৫৩ সনে একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে পরলোকগত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে চীনদেশে পাঠানো হয়েছিল। সেই দলে আমাকেও ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লাল চীনের মাটিতে পৌঁছেছিলাম ১৯৫৩ সনের ১৬ই জুলাই তারিখে—সেই সনের ২৭শে অগাষ্ট চীন দেশ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। দেশে ফিরে আসবার পর আমার কয়েকজন বামপন্থী হিতৈষী বন্ধু আমার চীনদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমায় দিয়ে লিখিয়ে ছাপিয়ে প্রকাশ করবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—কিন্তু আমার মন তাতে সায় দিল না; কারণ করতাম তো একটি বীমা অফিসের কেরাণীগিরি—সাহিত্যচর্চা করার সুযোগও কখনও পাইনি। কোনো বিষয়েই কিছু লিখবার মত বিদ্যে আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু বন্ধুরা নাছোড়বান্দা—তাঁরা আমায় বোঝালেন যে তখনকার দিনের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাধারণ পাঠকদের প্রতি কর্তব্য হিসাবে চীনদেশে আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখে জানিয়ে দেওয়া উচিত। অগত্যা আমার অপটু কলম দিয়ে আবেগের ভাষায় ওদেশে যা দেখেছিলাম তা লিখে ফেললাম এবং আমার সেই হিতৈষী বন্ধুরা কয়েক সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিকভাবে সেই লেখাগুলি 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

সেই সময়ে কোনো একটি সভাতে হঠাৎ পরলোকগত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমায় দেখেই তিনি হাসিমুখে সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন—'হারমোনিয়াম ছেড়ে হঠাৎ কলম ধরবার সখ হল কেন?'

কথাটি শুনে সত্যি খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম—'আপনার ভক্তদের পাল্লায় পড়েই এই ভুলটি করে ফেলেছি' এবং তৎক্ষণাৎ ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। কয়েকদিন পর আমার বন্ধুগণ আমার সেই খাপছাড়া লেখাগুলি বই-এর আকারে প্রকাশ করবার পরামর্শ দিতে শুরু করলেন—কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হইনি—কারণ মানিকবাবুর সেই কথাগুলি মনে পড়ে যেতো।

আমার কৈফিয়ৎ

১৯৫৩ সনে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই লেখাগুলি কেটে একটি খাতায় আঠা দিয়ে সেঁটে সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। দুই বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯৫৫ সনে ভারত সরকার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে চীনদেশে পাঠিয়ে ছিলেন—সেই দলে আমিও ছিলাম। সেবারে প্রায় আড়াই মাস চীনদেশে নানা জায়গায় গিয়েছি। নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট হয়েছিল এবং দুই বৎসরের মধ্যে ওদেশের সব ব্যবস্থার অগ্রগতি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেবারে ফিরে এসে কিছু লিখতে সাহস পাইনি—কারণ আমি তো লেখক নই।

তারপর বহু বৎসর কেটে গেল—১৯৭৭ সন শেষ হ'য়ে গিয়েছে—আর কয়েক মাস বাদে আমার বয়েসও সাতষট্টি পেরিয়ে যাবে। একে তো বার্দ্ধক্য এবং শ্বাসরোগ, তার ওপর নানা ধরনের ব্যারামে ভুগে ভুগে আমার শরীর একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। আমার ছোট্ট ঘরটিতে বসে বসেই মাঝে মাঝে খবর পাই কিছু সৎলোক অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে দেশের দরিদ্র এবং অনাথ ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য নানা ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে অর্থের সমস্যাটিই প্রধান সমস্যা। অনেকেই গানের অনুষ্ঠান ক'রে কিছু অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নিয়ে সেই সব অনুষ্ঠানে গান করার জন্য আমায় অনুরোধ জানিয়েছেন কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি তাঁদের সাহায্য করতে পারিনি। সেইজন্য খুব মানসিক অশান্তিতেও ভুগেছি।

একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। শ্রীখালেদ চৌধুরী নামধারী একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সূত্রপাতের সময় এবং কালক্রমে তিনি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁকে অবশ্য আমি জানতাম চিত্রশিল্পী এবং মঞ্চসজ্জা শিল্পী হিসাবেই। তিনি প্রায়ই আমার খোঁজখবর করতেন এবং এখনও করেন। কয়েক বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সময় নানা ধরনের ভারতীয় লোকসঙ্গীত, এমনকি বিদেশী সঙ্গীত-রচয়িতাদের সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। যদিও খালেদ বয়েসে আমার চাইতে বেশ ছোট তবুও সেদিন থেকে তাঁকে মনে মনে আমার ওস্তাদ ব'লে মেনে নিয়েছিলাম। তারপর থেকেই অনেক ব্যাপারে আমি খালেদের পরামর্শ চেয়ে থাকি। কয়েক মাস আগে খালেদকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার সেই 'স্বাধীনতা'র

আমার কৈফিয়ৎ

প্রকাশিত পুরানো লেখাগুলি বই-এর আকারে প্রকাশ করা যায় কি-না এবং যদি তা সম্ভব হয় সেই বই বাজারে চলবে কি-না। যদি এই ধরনের একটি বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয় তাহ'লে বইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থের আমার প্রাপ্য অংশের পুরোটাই দরিদ্র ও অনাথ বালক-বালিকাদের কল্যাণকর কাজে ব্রতী এমন কোনো সৎ-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দেওয়া হ'লে আমি খুব মানসিক শান্তি পাবো এবং খুশীও হবো। আমার কথা শুনে খালেদ খাতাটি নেড়ে চেড়ে দেখে নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে কিছু করা যায় কিনা দেখবেন। কয়েকদিন পর খালেদ আমায় খবর দিয়ে গেলেন যে 'কথাশিল্প' নামক একটি প্রকাশন সংস্থা আমার ঐ লেখাগুলো বই-এর আকারে প্রকাশ করতে রাজী হয়েছেন। বই-এর নামকরণ এবং অন্যান্য সাজসজ্জার ব্যবস্থা খালেদ সব নিজেই করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কথাশিল্পের শ্রীঅবনী রায় যে আমার মতো অ-লেখকের লেখা ছাপিয়ে বইটি প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। চীনদেশের যেসব কর্মীরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং যে সব শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমার প্রতি তাঁদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। পরিশেষে যাঁরা এই বইটি কিনবেন তাঁদেরকেও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

দেবব্রত বিশ্বাস

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর—বেলা প্রায় একটা—ইংরেজ-অধিকৃত হংকং-এর শেষ সীমানা পেরিয়ে নয়া চীনের মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। জীবনের প্রথম বিদেশ যাত্রা—এমনিতেই মনটা খুশীতে ভ'রে ছিল। যে চীনের এতো গল্প পড়েছি, এতো গল্প শুনেছি, সেই চীনকে যে নিজের চোখে দেখতে পাব কল্পনাও করিনি। তাই সেদিন যখন সত্যি সত্যি চীনে পৌঁছলাম, আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলাম।

সাড়ে-তিন দিনের পথ বেয়ে একদল ছেলেমেয়ে এসেছে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। ওদের সঙ্গে এসেছেন চীন শান্তি কমিটির 'লিয়াজোঁ' ডিপার্টমেন্টের ভাইস ডিরেক্টর, নাম মিঃ হু চুন পু। এক মিনিটের মধ্যে আমাদের সবাইকে আপন করে নিল ওরা। যেন কত কালের চেনা, কত দিনকার বন্ধুত্ব! ওরা সবাই ইংরেজী জানে—যত দিন চীনে ছিলাম, যত জায়গায় ঘুরেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের থাকতে হয়েছে। আমাদের দোভাষীর কাজ তো করেছেই, তা'ছাড়া আমাদের সব সুখ সুবিধার ব্যবস্থার ভার দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে বইতে হয়েছে ওদের। কী অসীম ধৈর্যসহকারে আমাদের সেবাযত্ন করেছে ওরা, তা' বলে শেষ করা যায় না।

সীমানা পেরিয়ে মিনিট চার পাঁচ হেঁটে স্টেশন ঘরে বসবার জায়গায় আমাদের বসতে দেওয়া হোল। দুরন্ত গরম—তাই লেমনেড্

বা আইসক্রীম সোডা প্রভৃতি পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। এক গ্লাস লেমনেড্ নিয়ে বসে আছি, হঠাৎ দলপতি শ্রীশচীন সেনগুপ্ত মহাশয় দুটি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখতো এরা কি বল্‌ছে— সব ঠিক ক'রে দাও।' ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। কার ক'টা 'লাগেজ' (মালপত্র) আছে, তার একটা হিসাব ওরা চাইছে। সব ডেলিগেটদের জিজ্ঞেস ক'রে মোট সংখ্যা জানিয়ে দিলাম— ওরা সংখ্যা মিলিয়ে নিল।
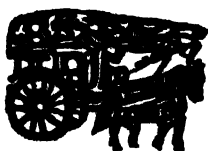
একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের জন্যে। এই ট্রেনটাই আমাদের সমস্ত চীন দেখিয়েছে ; ঐ দোভাষীদের মত ট্রেনটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে নতুন নতুন দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আমাদের জন্য দুটো গাড়ী—প্রত্যেক গাড়ীতে ছোট ছোট কয়েকটি কামরা, পাশ দিয়ে বারান্দার মত রাস্তা। এক গাড়ী থেকে অন্য গাড়ীতে যাবার জন্য গাড়ীগুলির সংযোগস্থলে সুড়ঙ্গের মত রাস্তা আছে। প্রত্যেক কামরায় চারটি বার্থ, ওপরে দুটো নীচে দুটো। ধবধবে পরিষ্কার বিছানা বালিশ। নীচে লাল কার্পেট পাতা—চার জোড়া চটি জুতোও রাখা আছে। একধারে একটা ছোট টেবিল—সুন্দর কাজ-করা টেবিলক্লথ দিয়ে ঢাকা। টেবিলের ওপরের তক্তাটা কব্‌জা দিয়ে বাক্সের ডালার মত আটকানো—ডালাটা তুললেই

হাত মুখ ধোবার জন্য জলের কল ও বেসিন। টেবিলের ওপর চারটে চীনেমাটির ছোট মগ—দু' প্যাকেট সিগারেট, দেশলাই ও ছাইদানি আর এক প্লেট টফি। জানালায় পর্দা লাগানো। সবশুদ্ধ একটা বেশ মনোরম পরিবেশ। কা'কে কোন কামরায় জায়গা দিতে হবে, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করে দিতে হ'ল—সেই তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক কামরার দরজায় নাম লিখে কার্ড টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় কি আছে দেখে নিলাম। আমাদের জন্য দুটো গাড়ী ছাড়া আরেকটি গাড়ী ছিল দোভাষীদের জন্য—তাতে এত আরামদায়ক ব্যবস্থা নেই—সেই গাড়ীটারই খানিকটা অংশে আমাদের মালপত্র রাখা হয়েছে। আরেকটি গাড়ী ছিল খাবারের (ডাইনিং কার); এই গাড়ীটিও সুসজ্জিত—সারি সারি টেবিল পাতা, দুধারে সুরুচিসম্মত ছবি টাঙানো। খাবারের গাড়ীতে এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসে গেলাম। জানালা দিয়ে বাইরে পাহাড়ের মালা দেখছি আর আকাশ পাতাল ভাবছি। একজন দোভাষী এসে ক্যান্টন হোটেলের একটা নক্সা এবং কিছু কার্ড দিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য হ'ল, হোটেলের ঘরগুলি ভাগ করে নিতে হবে আর কার্ডগুলিতে ঘরের নম্বর লিখে মালপত্রের গায়ে সেঁটে দিতে হবে। তাঁরা সেই নম্বর দেখে ঘরে ঘরে মালপত্রগুলি তুলে দিয়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, দলপতি শচীনদার নির্দেশক্রমেই এগুলি আমার কাছে আনা হ'য়েছে। বুঝলাম, একটি কাজের বোঝা আমার মাথায় চাপলো। দলপতি এবং বৃদ্ধ কবি ভাল্লাথোলের জন্যে সর্বাপেক্ষা ভাল দু'টি ঘর বেছে দিয়ে বাকীগুলি সবাইকে ভাগ করে দিলাম। প্রত্যেক ডেলিগেট দরকার মত কার্ড নিয়ে নিজেদের লাগেজে কার্ড লাগিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে ক্যান্টন পৌঁছে গেলাম। বেলা তখন প্রায় সাড়ে-পাঁচটা।

সারি বেঁধে প্ল্যাটফর্মে নামা মাত্রই একদল ছোট মেয়ে প্রত্যেকের হাতে এক-একটা বিরাট ফুলের তোড়া গুঁজে দিয়ে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। কী খুসী ওরা সবাই! আমরা যে বিদেশী ওরা যেন তা জানে না। ক্যাণ্টন শান্তি কমিটির সদস্যেরা, স্থানীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকরা আমাদের স্বাগত জানালেন। মনে পড়ে গেল, ছাত্রজীবনে গ্রীষ্ম অথবা পূজার ছুটিতে কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে দেশে ফিরে যাবার কথা। ঠিক এই রকমই বিকেল বেলা প্রায় সাড়ে-চারটায় আমাদের স্টেশনে গাড়ী থামতো। গাড়ী থামবার আগেই জানালা দিয়ে মুখ বা'র করে থাকতাম—কেষ্টা (কুলীর কাজ করতো) আমায় দেখতে পেয়েই দু'হাত তুলে আনন্দে নাচতে শুরু করতো। গাড়ী থেকে নামলেই আমায় জড়িয়ে ধরতো, তারপর বাক্স বিছানা নামিয়ে ঘোড়াগাড়ীতে তুলে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে কলকাতার সব খুটিনাটি খবর জেনে নিত। অনেক দিন পর দেশে ফিরতাম, তাই আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবের আদরের কোন সীমা থাকত না। বহু দিন বহু বৎসর পিছনে ফেলে এসেছি সে সব আদর যত্নের কথা, সে সব দরদ-মাখা কথাবার্তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন বিকালে যখন সবাই 'নী হাও' বলে প্রাণখোলা হাসি দিয়ে আমাদের আপন করে নিল—অনেকদিন অনভ্যাসের ফলে একটা সঙ্কোচবোধ করছিলাম ব'লে প্রথমে ওদের ওই অকৃত্রিম হাসির সুরে সুর মেলাতে পারিনি। সেজন্য কী যে যন্ত্রণা বোধ করছিলাম ব'লে বোঝানো যাবে না। কিন্তু বেশীক্ষণ লাগলো না। ওদের ভালবাসার টান এতই প্রবল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার যত দ্বিধা সঙ্কোচ সব কর্পূরের মত উবে গেল। আমার হারানো দিনগুলি যেন আবার ফিরে পেলাম।

ক্যাণ্টনে 'আই ছুং' (ভালবাস জনতাকে) হোটেলে আমাদের

থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছে—এখানে দুদিন বিশ্রাম ক'রে আবার পিকিং অভিমুখে রওনা হব। হোটেলে ন'তলায় আমার ঘর। ঘরে ঢুকেই জানালার কাছে দাঁড়ালাম—তখনও দিনের আলো রয়েছে—নীচে পিচ বাঁধানো রাস্তা, পাশে 'পার্ল' নদী, অসংখ্য বড় বড় নৌকো রাস্তার ধারে বাঁধা। কোনটাতে শাকসব্জি, কোনটায় পেঁয়াজ রসুন, আবার কোনটায় নানা রকমের ফল। স্টীমলঞ্চ, নৌকা, ডিঙি সর্বক্ষণ যাচ্ছে আর আসছে, বিরাম নেই। নদী তো নয়, যেন বিকেল বেলার চৌরঙ্গী।

রাত্তিরে স্থানীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে ভোজের ব্যবস্থা। অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে দোভাষীদের সাহায্যে আলাপ পরিচয় হ'ল। ছোট বক্তৃতা-পর্বের পর খাওয়া শেষ করে নিজেদের ঘরে ফিরে গেলাম। তখন গভীর রাত্রি। ভীষণ গরম, ঘুমের দেখা নেই। স্টীমারের বাঁশীর ভোঁ ভোঁ আওয়াজ ক্রমাগত চলছে। এক-একটা এক-এক সুরে বাঁধা, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। নরম গদী দিয়ে বিছানা করা। শোওয়া মাত্র মাঝখানটা গর্তের মত হয়ে যায়। গদীর দুধারে উঁচু হ'য়ে থাকে, তাতে গরম যেন আরও অসহ্য হ'য়ে ওঠে। এসব বিছানায় তো কোনো কালেই ঘুমোবার সৌভাগ্য হয়নি, সহ্য হবে কি করে? অগত্যা একটা লম্বা সোফা ছিল, সেটাকে জানালার ধারে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।
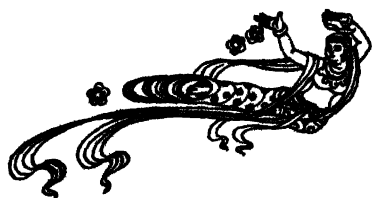
পরদিন দুপুরে দলপতির ঘরে ডেলিগেটদের মিটিং। আমাদের অনুষ্ঠানলিপির একটা খসড়া প্রস্তুত করার জন্য আলোচনা হবে। ডেলিগেটদের মধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তিনজন শিল্পী—দিল্লীর শ্রীমতী সুরিন্দর কাউর, আসামের শ্রীদিলীপ শর্মা আর বাংলা দেশ থেকে আমি। বাকী বাইশজনের মধ্যে কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-শিল্পী এবং কিছু নৃত্যশিল্পী। কাজে কাজেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যাপারে অকারণ মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই ভেবে আমার ঘরে এসে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘরে খুব সোরগোল, খুব উত্তেজিত হ'য়ে কয়েকজন শিল্পী এসে বলছেন যে—'বন্দে মাতরম্' গানটি বোম্বাই-এর কোন শিল্পী সুর দিয়েছেন এবং সেই সুরে গানটিকে আমাদের সব অনুষ্ঠানের উদ্বোধনসঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য বোম্বাই-এর শিল্পীর দল উঠে-পড়ে লেগেছেন এবং তাঁদের মধ্যে আমাদের দলের সেক্রেটারী কলিমুল্লা খানও আছেন। গানটির সুরও নাকি তেমন কিছু আহা-মরি সুর হয়নি। অতএব আমাকে এই সুখনিদ্রা ত্যাগ করে মিটিং-এ উপস্থিত হ'য়ে এবিষয়ে কিছু করতে হবে। কিন্তু বিদেশে এসে গৃহযুদ্ধ করাটা সমীচীন মনে হ'ল না—তাই নির্বিকার ভাবে আবার বিছানার আশ্রয় নিলাম।

বিকালের দিকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হল। কারণ সহর দেখতে যাওয়া হবে। বা'র হবার জন্যে তৈরি হয়েছি, হঠাৎ শচীনদা ডেকে পাঠালেন। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক দলের নেতা মিঃ হু চুন্ পু নাকি আমাদের শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং আমাদের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব তথ্য ইংরেজী ভাষায় লিখে দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ সেগুলি আগে পেলে তারযোগে পিকিং-এ জানিয়ে দেবেন এবং তাহলে আমাদের পিকিং পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনা ভাষায় আমাদের অনুষ্ঠানলিপি ছেপে তৈরি হ'য়ে থাকতে পারবে। আমরা মোট ২৯ জন ডেলিগেট, তার

মধ্যে ২৫ জন গানবাজনা এবং নাচের শিল্পী। এতগুলি লোকের পরিচয় এবং তাঁরা কে কি করবেন লিখে দেওয়া একটা বিরাট ব্যাপার এবং এই বিরাট বোঝাটি শচীনদা আমার মাথার ওপর চাপিয়ে দিলেন। সময় নষ্ট না করে কাজে বসে গেলাম। ভাগ্যিস আসার সময় আট শ' পান একটা ঝুড়িতে করে নিয়ে এসেছিলাম, তা না হলে এতো কাজ করা আমার মুস্কিলই হত। পিকিং পৌঁছে দিন তিন-চারেক পর্যন্ত পান খেতে পেরেছি। তারপর সব নষ্ট হ'য়ে গেল বলে পানদোষ ছাড়তে হ'ল।

রাত যখন প্রায় আটটা—জানতে পারলাম স্থানীয় শিল্পীদের একটা অনুষ্ঠান দেখতে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকক্ষণ কাজ করে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, একটু বিশ্রাম হবে ভেবে অনুষ্ঠান দেখতে চলে গেলাম। দুটো বাসে চড়ে রওনা হলাম—গাড়ী থেকে নামা মাত্র শুনতে পেলাম প্রচণ্ড হাততালির শব্দ আর আনন্দের চীৎকার। বড় রাস্তা থেকে একটি ছোট রাস্তা ধরে প্রেক্ষাগৃহে যেতে হয়। এই ছোট রাস্তাটির দুধারে সারি বেঁধে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা হাততালি দিয়ে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করছে। ঘরে ঢুকে দেখি প্রকাণ্ড ঘরটি একেবারে ভর্তি—বেশীর ভাগই ছাত্র। বাড়ীটির নাম 'ইয়ুথ কালচারাল প্যালেস' (যুবকদের সংস্কৃতি ভবন), সরকারী খরচে তৈরি। নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয়নি—দেয়ালে আস্তর পড়েনি। কিন্তু ব্যবহার করা আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। ওখানকার বিভিন্ন সংগঠনগুলি এই রঙ্গমঞ্চ বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারে। সেদিন ছিল চীনের বিখ্যাত দেশপ্রেমিক কবি নিয়েহ্-আর (চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার)-এর অষ্টাদশ মৃত্যু-বার্ষিকী। তাঁর লেখা গান, অন্যান্য লোকসঙ্গীত এবং আধুনিক সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশন করা হচ্ছে। সেদিনকার অনুষ্ঠানে সব চাইতে ভালো লাগলো একটি সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীত। মুক্তিফৌজের সাজপোশাক পরিহিত কয়েকটি ছেলে শত্রুপক্ষের বোমারু উড়োজাহাজের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে একটি গান শোনাল। কি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, কি ভাবের অভিব্যক্তি! পাশের

দোভাষীর কাছ থেকে আবার গাইতে অনুরোধ করার চীনা ভাষাটা জেনে নিলাম—গান শেষ হওয়া মাত্রই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম—'চাইলাই ইগো'—(আবার কর)। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে আওয়াজ উঠলো 'চাইলাই ইগো'—হাততালিও চলতে লাগলো। ওদের হাত-তালির একটা মজা দেখলাম। প্রথম পাঁচ-দশ সেকেণ্ড এলোপাথাড়ি হাততালি পড়ে, তারপরেই কি করে যেন হঠাৎ তালে তালে তালি বাজতে থাকে এবং সেই তালের লয়টি আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে থাকে। অদ্ভুত!

আবার সেই গানটি হলো। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে কাজে হাত দিলাম। অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের টাইপিস্ট টাইপ করে নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে পিকিং-এর হোটেলের নক্সা ও মালপত্রের কার্ড আবার এসে গেল। দোভাষীরা অনুরোধ করলেন, মালপত্রগুলিতে কার্ড লাগিয়ে ডেলিগেটরা যেন ঘুমোতে যাবার আগে দরজার বাইরে রেখে দেন—শেষ রাত্তিরেই সেগুলি ওঁরা ট্রেনে নিয়ে যাবেন। কারণ, ভোরবেলা আমাদের ট্রেন পিকিং যাত্রা করবে। ওঁদের কথা মত কাজ হয়ে গেল। তারপর লেখার কাজ করতে করতে রাত দুটো যখন বাজে তখন জানালাম যে সারারাত কাজ চললেও শেষ করা অসম্ভব, অতএব ট্রেনে বসে ধীরে সুস্থে করা যাবে। ওঁরা রাজী হলেন, তাই ছুটি পেলাম—কিন্তু সে রাত্তিরে ঘুম আর হ'ল না। ভোরবেলা ক্যান্টন থেকে বিদায় নিলাম।

ট্রেনে সকাল বেলার প্রাতরাশ পর্ব সমাধা করে ভাবলাম রাত্তিরের অসমাপ্ত কাজটা একটু এগিয়ে নিয়ে যাই। কাগজপত্র নিয়ে খাবারের গাড়িতে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যেই কয়েকজন দোভাষী কয়েকটি টেবিল দখল ক'রে আমার রাত্তিরের লেখাগুলির চীনে ভাষায় তর্জমা করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমিও একটি টেবিল নিয়ে বসলাম কিন্তু কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছি না। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। ট্রেনটা বেশ জোরেই চলছে। পাহাড়ের পর পাহাড়—হঠাৎ মাঝে এক চিলতে সবুজ ধানের ক্ষেত অথবা ভুট্টা ক্ষেত। রেল লাইনের বাঁ পাশ দিয়ে এক পাহাড়ী নদী মাইলের পর মাইল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। হঠাৎ দিলীপ শর্মা উপস্থিত। জিজ্ঞেস করলাম—'কি—আসাম-আসাম লাগছে বুঝি?' ও একগাল হেসে বললো, 'হুবহু—মনে হয় দেশেই আছি।' সকাল বেলায় কিছু কাজ করে নিলাম।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হবে—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এতো অসহ্য গরম যে কামরার মধ্যে বসে থাকা অসম্ভব। ছোট একটি পাখা দরজার ওপরে লাগানো রয়েছে বটে কিন্তু তার হাওয়া ঐ দারুণ গ্রীষ্মের গরমের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমাদের কামরায় শচীনদা, বিলায়েৎ হোসেন আর আমি। ওঁরা দু'জন কিন্তু বেশ ঘুমিয়ে পড়লেন, আমি নিরুপায় হ'য়ে বাইরে চলে এলাম। এঘর-ওঘর করে দুপুর ও বিকালটা কেটে গেল। কিন্তু রাত্তির কাটানো যায় কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিলায়েৎ-এর অবস্থা আমার মত হ'য়ে পড়েছে। ট্রেনটার পিছন দিকে খানিকটা জায়গা বারান্দার মত—বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে—সেখানে মেজের ওপর তক্তাতে শুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়েছি, হঠাৎ একজন দোভাষী এসে বললেন, এখানে শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে—সর্দি-কাশি তো হবেই, নিমোনিয়ার ভয়ও আছে। কাজে-কাজেই উঠে

পড়তে হ'ল। খাবারের গাড়িতে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে জানালার ধারে বসে ভাবছি, কি করা যায়। অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর মনে হল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগে আবার সেই পিছনের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে দেরী হল না।

হঠাৎ মাঝরাত্তিরে কে আমায় জাগাতে চেষ্টা করছে! চোখ বুজে ভাবলাম, নিশ্চয়ই আবার কোন দোভাষী এসে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় দেখাবে—তাই ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলাম। কিন্তু সেও নাছোড়বান্দা, একটু চোখ খুলে দেখি রেলের একজন কর্মচারী আমার জন্য একটি কম্বল আর দুটো বালিশ এনেছে বিছানা করে দেবার জন্যে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই সে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে ইসারায় আমায় ঘুমোতে বলে আমার কাছে বসে থাকলো। পাশেই দরজার মত ফাঁক কিন্তু দরজা নেই। পাছে আমি সেই ফাঁক দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে যাই সেই ভয়ে সে দরজার ধারে বসে রইল।

পরদিন সকালে সাড়ে-এগারোটায় উচাং স্টেশনে নামতে হল। কারণ, এখানে ইয়াংসি নদী 'ফেরী' করে পার হতে হল। বিরাট নদী। জলের রং বাদামী ধরনের ঘোলাটে। নদী পার হয়ে হাংকিউ শহরে কয়েকটি ঘণ্টা কাটাতে হলো। বিকালে সাড়ে-চারটায় আবার ট্রেন রওনা হল।

দিল্লীতে কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমায় একটা গান লিখে দিয়েছিলেন—তাড়াতাড়িতে সুরটা তোলা হয়নি। সুরিন্দর কাউর-এর গানটা জানা ছিল। তাঁর কাছ থেকে ট্রেনে বসে গানটা শুনে নিলাম; একটা স্বরলিপিও তৈরি করে নিলাম। এই গানটি হারীন-বাবু ভারত ও চীন মৈত্রীর ওপরে বিশেষ করে রচনা করেছিলেন এবং রওনা হবার আগে আমাকে এই গানটি গাইতে অনুরোধ করেছিলেন।

২০শে জুলাই ১৯৫৩। রাত্রি বারোটার খানিকটা পরে পিকিং পৌঁছে গেলাম। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আলোয় আলোয় আলোকময়। এখানেও সেই ফুলের তোড়া। চীন শান্তি কমিটির বড় বড় নেতারা ও বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক কর্মী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অগণিত মানুষের মাঝখান দিয়ে পথ কেটে স্টেশনের বাইরে এসে বাসে চড়ে হোটেলে গেলাম।

পিকিং 'পীস্ হোটেলে' পাঁচ তলার ওপরে পাঁচশো এগারো নম্বর ঘরে বিলায়েৎ হোসেন খান এবং আমার জায়গা হয়েছে। ঘরে ঢুকেই কোথায় কি আছে দেখে নিয়ে চলে গেলাম অন্যান্য ডেলিগেটদের খোঁজ খবর নিতে। শচীনদার ঘরেও গেলাম—ব্যবস্থাপনায় উনি ভীষণ খুশী। দেখাশোনা শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে মালপত্র সব ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। বিলায়েৎ সৌখিন লোক—যে ভাবে খাট টেবিল চেয়ার সব সাজানো ছিল সেটা তার মনঃপুত হয়নি, তাই আবার নতুন করে ঘর সাজাতে শুরু করল।

রাত প্রায় দুটো। সবাই শুয়ে পড়েছেন। ভেবে দেখলাম, কল-কাতায় এতক্ষণে দশটা কিংবা সাড়ে-দশটা। এত শীগগির ঘুম আসবে না, তাই ভাবলাম কিছু চিঠি লিখি। টেবিলের ওপর চিঠি লেখার কাগজ, খাম, কালিকলম, পেনসিল, একটা সবুজ রঙের নোটবই ইত্যাদি সাজানো। প্রথমেই আমার সহকর্মী (হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের) শ্রীমান সুনীল ভট্টাচার্যকে লিখলাম। কারণ পিকিং-এর ডাকঘরের

ছাপমারা একটা চিঠি পাবার ভারী সখ তার এবং এই সখের খবরটি সে আমায় দিয়ে রেখেছিল। আরো দুয়েকটি চিঠি লিখে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। চতুর্দিক অন্ধকার, মাঝে মাঝে রাস্তার আলো জ্বলছে। এই সেই পিকিং শহর যার এতো গল্প পড়েছি। কতদিনকার পুরানো শহর পিকিং। মাত্র কয়েক বৎসর আগেও কত দুর্ভাবনায় কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে এখানকার বাসিন্দাদের। আজ আর তাদের কোন দুর্ভাবনা নেই—তাই নিশ্চিন্ত মনে সমস্ত শহরটি ঘুমিয়ে রয়েছে। থেকে থেকে শচীনদার একটা কথা মনে হচ্ছিল, 'কি করে সম্ভব হলো!' ক্যান্টন থেকে পিকিং সাড়ে-তিন দিনের পথ—পার্বত্যভূমি অতিক্রম করে আমাদের ট্রেনটা যখন সমতল ভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, দুদিকে যতদূর চোখ যায়, দেখেছি সমস্ত দেশটা জুড়ে যেন একটা সবুজ কার্পেট পাতা। ধান, ভুট্টা, সয়াবিন্ এবং নানা ধরনের সব্জির ক্ষেত দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—কোথাও কোন জায়গা ফাঁকা পড়ে নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় ধবধবে পরিষ্কার পোশাক পরা চাষীরা মাথা উঁচু করে, বুক টান করে হেঁটে যাচ্ছে—কেউবা ক্ষেতের মাঝখানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে—হয়তো বা ফসলকাটার পরের আনন্দময় দিনগুলির স্বপ্ন দেখছে। পথে কোন স্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে ইন্‌জিনে জল ভরে নেবার জন্যে—রং-বেরঙের পোশাকপরা চাষীর ছেলে-মেয়েরা আমাদের দিকে অবাক হয়ে দেখছে। চাষীরা, ছেলে মেয়েরা সবাই খুশী কারণ অত্যাচার ও নির্যাতনের জোয়াল ঝেড়ে ফেলে আজ চীনের চাষী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—নিজেদের বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে। পথে আসতে আসতে ওদের দেখে কতবার যে শচীনদা আমায় বলেছেন, 'আমি শুধু ভাবছি, সমস্ত জাতিটার এত দ্রুত পরিবর্তন কি করে সম্ভব হল!' তাই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শচীনদার ঐ কথাগুলি মনে হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে যে দোভাষীরা কাজ করতেন, তাঁদের ছাড়াও

এই ক'দিনে পথে অনেক চীনে মুখ দেখেছি—লক্ষ্য করে দেখেছি ওদের মুখগুলি হাসি-খুশি অবস্থাতে থাকলেও চোখের মধ্যে একটা করুণ ভাব। ওদের চোখের দিকে একটু নজর করলেই হাজার হাজার বৎসরের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার একটা করুণ ইতিহাস মনের মধ্যে যেন জেগে ওঠে। আজ চীনে দুঃখরজনীর অবসান ঘটেছে। বিগত দিনের দুঃসহ অত্যাচার ও নির্যাতনের কবল থেকে রেহাই পেয়ে এক নতুন গৌরবময় ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন যে চীনের জনসাধারণ, সেই মুক্তচীনের রাজধানীতে এসে, পীস্ হোটেলের পাঁচতলায় অন্ধকার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকটে'র শেষ ক'টি কথা। ভাবছিলাম, এ-ই কি তবে সেই 'পূর্বদিগন্ত' যেখান থেকে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনানো হবে?

পরদিন সকালবেলা উঠতে একটু দেরিই হয়ে গেল। স্বাস্থ্যহানির দরুণ সকালবেলা কিছু খাওয়ার অভ্যেসটি অনেকদিন ত্যাগ করেছি। তবু আটতলায় খাবার ঘরটা দেখতে গেলাম—গিয়ে দেখি ব্রেক-ফাস্ট খাবার ধুম লেগে গেছে। মস্তবড় খাবার ঘর—পাশেই ছাদের মত খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে গিয়ে সমস্ত পিকিং শহরটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। বিভিন্ন ধরনের বাড়ী-ঘর, দালানগুলি আমাদের দেশের মতই—আবার কতকগুলিতে রং করা টালির ছাদ—সাবেক কালের ধরনের বিরাট বিরাট ঘর—ঘরের কোণগুলি হাতীর দাঁতের মত উঁচু করে তোলা। মনটা একটু অধীর হ'য়ে উঠলো, শহরটাকে ভালো করে না দেখতে পেলে যেন শান্তি নেই।

লেখার কাজ যা বাকি ছিল সবই শেষ করে ওদের হাতে দিয়ে দিয়েছি। আপাততঃ কোন কাজ ছিল না বলে ঘরে বসে আছি। হঠাৎ একজন দোভাষী, নাম চাও সিং নান, খবর দিয়ে গেলেন—হোটেলের একতলায় চুল-দাড়ি ছাঁটাই করার ব্যবস্থা আছে—দরকার

হলে সেখানে যেন যাই। কিছুক্ষণ পরে আবার একজন এলেন, নাম স্যাং স্নুয়ে লিঙ্, তাঁর কাজ ময়লা কাপড়-চোপড় ধোওয়ার ব্যবস্থা কোথায় আছে জানিয়ে দেওয়া। আমার ঘরের পাশেই হোটেলের কর্মচারীদের ঘর—সেখানে কাপড় দিয়ে দিলেই ধোবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হোটেলের কর্মচারীদের বয় বা বেয়ারা বলে ডাকার রীতি নেই। কমরেড-এর চীনে সংস্করণ 'তনজ' বলে সম্বোধন করা হয়। এই 'তনজ' কথাটির বর্গীয় জ'টির উচ্চারণ হবে tze-র মত। কিছুক্ষণ পর আরেকজন দোভাষী এলেন—সঙ্গে একজন নতুন মেয়ে, আগে দেখিনি। মেয়েটির বয়েস উনিশ কুড়ির বেশী হবে না—তার নাম মিস ল্যু ওয়ান্ জু। ওঁরা জানতে পেরেছেন যে, আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং মঞ্চের কাজ দেখাশোনা করার ভার আমার ওপর পড়েছে, তাই মিস ল্যু-কে পাঠানো হয়েছে আমায় সাহায্য করার জন্য। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ল্যু সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে, মঞ্চ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই তার। ভাবলাম, এইটুকু মেয়ে কিইবা করতে পারবে কে জানে। আমাদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান-লিপির একটি খসড়া এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা পড়ো।' আমায় সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে—'এটা আমার আগেই পড়া হয়ে গেছে।' মঞ্চে কি কি দরকার হবে সব বললাম—গান এবং বাজনার সময় কিরকম আলো দিতে এবং কোন নাচে কি রঙের আলোর ব্যবস্থা হবে সব তথ্য মনোযোগ দিয়ে শুনলো, কিছু কাগজে লিখে নিল। আমাদের গান এবং নাচের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু খবরও দিয়েছিলাম। পরের দিন অর্থাৎ ২২শে জুলাই বিকাল পাঁচটায় আমায় মঞ্চ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ল্যু বিদায় নিল।

বিকালের দিকে চীন শান্তি কমিটির কয়েকজন নেতা এসে আমাদের চীন ভ্রমণের ও পরিদর্শনের একটি প্রোগ্রাম দিয়ে গেলেন। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী পিকিং শহরে আমাদের থাকতে হবে দশদিন—

৩০শে জুলাই পর্যন্ত ; তারপর ৩১শে জুলাই ট্রেনে চড়ে দেখতে হবে কোয়াংচিং জলের বাঁধ এবং ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীর। পয়লা অগাস্ট পিকিং ছাড়তে হবে। এই দশদিনের মধ্যে আমাদের একদিন ড্রেস রিহার্সালের মত একটি অনুষ্ঠান করতে হবে সাংবাদিকদের জন্য। তাছাড়া নানা ধরনের দর্শকদের জন্য আরও চারটে অনুষ্ঠান করা হবে।

দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে ১। উইন্‌টার প্যালেস ও পেহাই পার্ক, ২। ইমপিরিয়াল প্যালেস, ৩। সামার প্যালেস, ৪। টেম্‌পল অব হেভেন, ৫। স্কুল কলেজ, ৬। মসজিদ ও মন্দির, ৭। পিকিং অপেরা, ৮। ফিল্ম, ৯। গ্রাম। এছাড়া তুদিন পিকিং-এর শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং ভাবের আদানপ্রদান ; তিন চারটে ব্যাংকোয়েট বা ভোজ, একদিন চীন দেশের এ্যাক্রো-ব্যাটদের খেলা। মাত্র দশ দিনের মধ্যে এতো বড় একটা কর্মসূচী কি করে শেষ হবে ভেবে পাইনি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ ঠিকই হয়েছে কিন্তু সময়াভাবের জন্য মনের মতন করে দেখা হ'ল না। একটি রাজপ্রাসাদের একটি দিকে যাত্ন-ঘরের একটি অংশ অবস্থিত ; তাতে খ্রীস্ট-পূর্ব ২০০০ বৎসর থেকে আরম্ভ করে ১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নানা যুগের নানা ধরনের শিল্পের কাজ সংগ্রহ করে সযত্নে রাখা হয়েছে। চীন দেশের প্রাচীন চারু শিল্পের ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এই ঘরটি দেখা নিতান্তই অপরিহার্য। গবেষণার কথা বলছি না, শুধু ভাল করে দেখতে গেলেও অন্তত মাসখানেকের কমে ঠিক দেখার মত করে দেখা হয় না। তবে এটুকু বলবো যে বিভিন্ন কালের সম্রাটদের বিরাট বিরাট প্রাসাদগুলি কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবিশেষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার না করে জনহিতকর কাজে কি করে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞানলাভ হয়েছে। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে সব কিছু দেখার মধ্যে ভালো করে দেখার সুখটি পাওয়া যায় না—

একটা অতৃপ্তির ভাব মনে থেকে যায়। একটা কিছু দেখে এসে ভালো করে হজম করার আগেই আরেকটা এসে পড়ে—তাতে গরহজমের আশঙ্কাই বেশী। কিন্তু উপায় নেই—আমাদের শিল্পীদের তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে হবে।

রাত্তিরে শান্তি কমিটির উদ্যোগে ভোজ—ভোজ তো নয়—যেন ভোজবাজী। একটা তরকারী খেতে খৈতে বললাম—'বাঃ, এটা কী মাছ? মাংসের মত খেতে লাগছে?' একজন দোভাষী হেসে বললেন, 'ওটা আমিষ নয়, নিরামিষ।' আমি তো অবাক! আরেকটি তরকারীতে খুব ঘন ঝোল—ভেতরে ছোট ছোট কাঠির মত পদার্থ দেখা যাচ্ছে। নিরামিষ তরকারী ভেবে সরিয়ে রাখলাম। দোভাষীটি হেসে বললেন, 'আপনি তো আমিষ খান—ওটা মাছ।' আমাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় অনেকে ছিলেন এবং তাঁরা প্রায় সবাই নিরামিষাশী, তাছাড়া আরো কয়েকজনও নিরামিষ খেতেন। তাই মাছ বা মাংসের বিশেষ কোন পদ রান্না হলে নিরামিষাশীদের জন্য একই রকম দেখতে নিরামিষ পদ রান্না করা হোত—দেখলে আমিষ কি নিরামিষ ধরা মুশকিল। চীনের মিস্ত্রী ও কারিগরের নাম-ডাক শুনেছি বটে কিন্তু চীনে বাবুর্চির কেরামতির খোঁজ পেলাম পিকিং-এ এসে। পিকিং পৌঁছানোর আগেও চীনে বাবুর্চির রান্না খেয়েছি কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করিনি বলে এতটা টের পাইনি। কত রকম রান্না যে ওরা জানে তার কোন হিসাব নেই। খাবারগুলি প্লেটে সাজিয়ে দেবার ভঙ্গীটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওরা কতবড় শিল্পী। অনেক জায়গায়

দেখেছি তরমুজের মুখটি কেটে তার ভেতরে নানা রকম জিনিষ পুরে তরমুজটাকে গরম জলে বসিয়ে দিয়ে স্যুপ তৈরী করা হয়েছে। তরমুজের মুখ এত চমৎকার করে কাটা হয়েছে যে মনে হয় একটি ফুল ফুটে আছে। আবার তরমুজের গায়ে ছুরি বা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে নানা ধরনের সূক্ষ্ম কাজ খোদাই করা হয়েছে—অনেকটা আমাদের দেশের ঘটের নক্সার মত। টেবিলে গেলাসের ভেতরে ন্যাপকিন রাখার কায়দাটি আরও মজার। খুব কড়া ইস্তিরী করা ন্যাপকিন এমন সুন্দর করে ভাঁজ করা হয় যাতে কোনটাকে মনে হবে ফুলের গাছ আবার কতগুলি দেখতে হবে নানা রকম ফুলের মত। টেবিলের ওপরে কাঁচের গ্লাসে এগুলি যখন সাজানো থাকে দেখতে অপূর্ব লাগে। চীনের বাবুর্চিদের শিল্পীমনের পরিচয় ছাড়াও ওদের আরেকটি পরিচয় আমি পেয়েছি। আমাদের দক্ষিণভারতীয় শিল্পীদের একটু তেঁতুল বা টক, ঝাল ও চাটনীর অভাবে খাওয়া ব্যাপারে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। খুব শীগগীরই ব্যাপারটি বাবুর্চিদের গোচরীভূত হয়ে গেল। দোভাষীদের সাহায্যে দক্ষিণভারতীয় রুচি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়ে প্রথম যেদিন টক দিয়ে ডাল, মুগ ডালের বড়া, লঙ্কার চাটনী ও কুচোনো কাঁচালঙ্কার ব্যবস্থা করল সেদিন আমাদের শিল্পীদের কি আনন্দ! কিন্তু বাবুর্চিদের প্রসন্ন মুখের দিকে নজর করে দেখলাম তারা আরও খুশী। কি দরদী মন! এই ব্যাপারে আমাদের দোভাষীদেরও উদ্বেগ কম ছিল না, তারাও যেন মস্ত একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। এর পরে যত শহরে গিয়েছি এই ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম দেখিনি।

পরদিন, ২২শে জুলাই, সকালবেলা উঠেই দেখি আমাদের হোটেলের পাঁচতলা গমগম করছে। নানা রকম আওয়াজ—হৈ হৈ কাণ্ড! ব্যাপারটি বুঝতে অবশ্যি বেশী দেরি হ'ল না, কারণ আওয়াজ-গুলি বেসুরো ছিল না। আমাদের শিল্পীরা সব রেওয়াজ সুরু

করেছেন। কেউ তবলা, কেউ সারেঙ্গী, কেউ বীণা, কেউ বা মৃদঙ্গ নিয়ে হাত গরম করে নিচ্ছেন। আবার কণ্ঠসঙ্গীতের শিল্পীরাও তানপুরা ছেড়ে আপনমনে সুরের জাল বুনে যাচ্ছেন। নৃত্য-শিল্পীরাও বাদ নেই। হীরাবাঈ বরোদেকার, বিলায়েৎ হোসেন এবং সুরিন্দর কাউর ছাড়া বাকি শিল্পীদের প্রতিভা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। তাই ওঁদের ঘরে গিয়ে সামনে বসে গান-বাজনা শোনার লোভ সামলাতে পারলাম না। সবারই ঘরে অল্পক্ষণ থেকে শুনে এলাম— মনটাও খুশি হয়ে উঠলো। নিজের ঘরে গিয়ে হারমোনিয়ামটি বার করে হারীনবাবুর 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' গানটি মুখস্থ করার চেষ্টায় বসলাম। এমন সময় শচীনদা এসে আমাদের ঘরে উপস্থিত। গানটি শুনলেন—মুখ দেখে মনে হ'ল খুব খুশী হলেন না। জিজ্ঞেস করলাম—'ভালো লাগলো না বুঝি?' মাথা নেড়ে বললেন, 'সুকান্তের 'অবাক পৃথিবী' গানটার মত লাগেনি।' হেসে বললাম—'এ গানটা নিয়ে কিন্তু হৈ হৈ পড়ে যাবে।' শচীনদা অবশ্যি কথাটা মেনে নিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ বাদে কি কাজে বেরিয়ে গেলেন, আমিও আবার গানে মন দিলাম।

দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম করাও শেষ—ঘরেই শুয়ে আছি— হঠাৎ দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ হওয়ায় ইংরেজীতে বললাম, 'দয়া করে ভেতরে আসুন।' দরজা খুলে ঢুকলেন মিস ল্যু। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তখন ঠিক পাঁচটা বেজেছে এবং আমায় মঞ্চ দেখতে যেতে হবে। একটি পান মুখে গুঁজে আমার ওষুধের লম্বা একটি কৌটো হাতে নিয়ে রওনা হলাম। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেখি সবই প্রস্তুত। যে রকম ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম তার একচুলও ব্যতিক্রম হয়নি। মঞ্চে ভারতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে শচীনদা একটি কুঁড়েঘর, একটি মন্দির ও কয়েকটি কলাগাছের ছবির ফরমাশ দিয়েছিলেন সেগুলিও উত্তমরূপে সাজানো হয়ে গেছে। আমার আর বিশেষ

কিছু করবার ছিল না। মঞ্চের ওপর কার্পেট পাতা ছিল, সেটা সরিয়ে চটিজুতো খুলে রেখে বার কয়েক পায়চারী করে দেখে নিলাম পেরেক বা অন্য কিছু আছে কি না।

সাজবার ঘর কোনটা ছেলেদের ও কোনটা মেয়েদের হবে বলে দিয়ে এবং আমাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি সুর করবার জন্য একটি কার্পেট-বিছানো ঘরের ব্যবস্থা করে হোটেলে ফিরে এলাম।

সেদিনই রাত্রি আটটায় আমাদের ড্রেস রিহার্সাল। সাংবাদিক ছাড়াও বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের শিল্পীদের অধিকাংশই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের, একবার আরম্ভ করলে আর থামতে পারেন না। তাই অনুষ্ঠান শেষ হতে চার ঘণ্টার বেশী সময় লেগে গেল। অনেকেরই মনে হল সময়টা একটু বেশী লেগেছে—আরও কমানো দরকার। হোটেলে ফিরতে বেশ দেরি হল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পী শ্রীমতী সুরিন্দর কাউরের সঙ্গে আমার জানাশোনা অনেকদিনকার; তিনি আমায় দাদা বলে সম্বোধন

করতেন এবং সেই সূত্রে আমি হয়ে গেলাম সর্বজনীন দাদা। ডেলিগেশনের নেতা শচীনদা ও বৃদ্ধ কবি ভাল্লাথোল ছাড়া সবাই আমায় দাদা বলে ডাকতে শুরু করলেন। দলে আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড় আরও কয়েকজন শিল্পী ছিলেন, তাঁরাও দেখি ছোটদের দলে। ফলে দাদাগিরি করার কাজে আমার বেশ সুবিধেই হয়ে গেল। শিল্পীরা (আমাদের দেশের শিল্পীদের কথা বলছি) সাধারণত একটু অভিমানী হয়ে থাকেন। ডেলিগেশনের শিল্পীদের অধিকাংশই আবার একক শিল্পী, দলবদ্ধ ভাবে কাজ করা হয়তো অনেকের এই প্রথম। ভারি ভয় ছিল কি কেলেঙ্কারীই না জানি হয়, কিন্তু শেষে দেখা গেল আমার ভীতি নিতান্তই অমূলক। আমাদের অনুষ্ঠান ব্যাপারে আমাদের শিল্পীরা খুব শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু নামেই নয় কাজেও সবাই দাদার সম্মান আমায় দিয়েছিলেন।

পিকিং শহরে আমাদের চারটি অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল—প্রথমটি ২৩শে জুলাই, তিনদিন বাদে পর পর ছুদিন ২৬শে ও ২৭শে এবং শেষ অনুষ্ঠানটি ২৯শে জুলাই। ড্রেস রিহার্সালের দিন চার ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছিল বলে দাদাগিরির প্রথম ধাপ হিসাবে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান তিন ঘণ্টায় শেষ করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শিল্পীর নামের পাশে কত মিনিট সময় দেওয়া হবে লিখে দিয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে জানিয়ে দিলাম। কম সময় দেওয়া হয়েছে বলে কোন শিল্পী কোন আপত্তি করলেন না। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৬শে জুলাই চীন সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সব উপস্থিত থাকবেন। সেদিন সকালে চীন শান্তি কমিটির নেতারা সেদিনকার অনুষ্ঠানটি ছু' ঘণ্টায় শেষ করবার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত! ঐ দিনের অনুষ্ঠানলিপির একটি নকল এখানে দেওয়া হল। এর আয়তন দেখলে, আমাদের শিল্পীদের কি অসাধ্য-সাধন করতে হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত হবে না।

অনুষ্ঠানলিপি—২৬শে জুলাই

১।	বন্দে মাতরম্		সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীত
২।	হিন্দি চীনি ভাই ভাই		যুগ্ম ,,
৩।	তবলা	একক	ইন্দোরকার
৪।	হাস্য-কৌতুক	,,	চন্দ্রশেখরন্
৫।	মৃদঙ্গম্	,,	মূর্তি
৬।	উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত	,,	মাষ্টার কৃষ্ণন্
৭।	ব্যাধ নৃত্য	,,	গোপালকৃষ্ণ
৮।	তামিল গান	,,	এল্লাপ্পা পিল্লাই
৯।	অসমীয়া লোকসঙ্গীত	,,	দিলীপ
১০।	ভরতনাটাম্ নৃত্য	,,	চন্দ্রলেখা
১১।	সেতার	,,	বিলায়েৎ
১২।	পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীত	,,	সুরিন্দর
১৩।	তবলা	,,	দাসাপ্পা
১৪।	তার সানাই	,,	গোলওয়ালকার
১৫।	উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত	,,	হীরাবাঈ
১৬।	বীণা	,,	দেবেন্দ্রাপ্পা
১৭।	হিন্দি লঘুসঙ্গীত	,,	জ্যোৎস্না
১৮।	কথক নৃত্য	,,	দময়ন্তী
১৯।	বাংলা গান	,,	আমি
২০।	কথাকলি নৃত্য		সম্মিলিত

মোট কুড়িটি পদ, তাছাড়া ঘোষণা তো আছেই। মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করা চাই। কারণ চীন সরকারের নেতারা কিছুতেই আর বেশি সময় করতে পারছেন না অথচ আমাদের শিল্পীদের কাউকেই তাঁরা না দেখে ছাড়বেন না। কী বিপদ! যে শিল্পীদের পেলে কলকাতায় তিন চার দিন ব্যাপী একটি বিরাট সঙ্গীত সম্মেলনের

আয়োজন করা যায় এবং যে শিল্পীদের গলা বা হাত গরম করতেই ঘণ্টা খানেক কেটে যায় তাঁদের আমি কী করে কী বোঝাই ?

খুব সাহস সঞ্চয় ক'রে হীরাবাঈ বরোদেকারের ঘরে ঢুকলাম। বাঙ্গালী হিন্দিতে বুঝিয়ে বললাম, 'হীরাদিদি, আজকে আপনাকে ছয় মিনিট গাইতে হবে।' কথাটি বলে ফেলেই ভীষণ ভয়ও হ'তে লাগলো, এই বুঝি কোন অবাঞ্ছিত কথা শুনতে হয়। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ও এই সঙ্গীতের শিল্পীদের সম্বন্ধে যাঁর খুব সামান্য ধারণাও আছে তিনিই বুঝবেন যে হীরাবাঈর মত শিল্পীকে মাত্র ছয় মিনিট গাইতে অনুরোধ করা কি সাংঘাতিক অপমানজনক প্রস্তাব। বিদেশ বলে রক্ষে,—এদেশে যদি এরকম একটি ব্যাপার ঘটতো তা'হলে পকেটমার ধরা পড়লে চাঁদা করে যে ব্যবস্থাটি করা হয় সে রকম একটি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হোত। হীরাবাঈ আমার বিব্রতভাব লক্ষ্য করে হেসে হিন্দিতে বললেন, 'ঠিক আছে দাদা, আপনি ঘাবড়াবেন না—দরকার হ'লে ছয় মিনিটের কমেও আমি চালিয়ে নেব।' শ্রদ্ধায় মনটা ভ'রে উঠলো। মুখে বললাম, 'বহুৎ সুক্রিয়া' আর মনে মনে বললাম, 'হীরাদিদি, আপনিই যথার্থ শিল্পী।'

অন্যান্য সব শিল্পীদের কাউকে চার মিনিট কাউকে ছয় মিনিট দেওয়া হ'য়েছিল বলে কেউ মেজাজ খারাপ করেননি। নিজের ঘরে বিলায়েৎকে যখন বল্‌লাম তাকে ছয় মিনিট বাজাতে হবে, সে হেসে ব'ললে, 'রেকর্ডে তো আরও কম সময় বাজাই—ঠিক আছে দাদা—রেকর্ডের মত করে বাজিয়ে দেব।'

নাচের একটা বিশেষ আবেদন আছে। নৃত্যশিল্পীদের একটু বেশি সময় দেওয়া হয়েছিল এবং সেজন্য কোন মন্তব্য আমায় শুনতে হয়নি। অনুষ্ঠানটি অবশ্যি ২ ঘণ্টা ১০ মিঃ এর মধ্যেই শেষ হয়েছিল। এর পর আর কোনদিন সময়ের এত টানাটানি পড়েনি।

বলাবাহুল্য আমাদের অনুষ্ঠানগুলি সবই খুব উচু দরের হ'য়েছিল ;

আর কেনই বা হবে না ? প্রত্যেকটি শিল্পী তো নাম-করা। প্রত্যেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন যাতে ভারতবর্ষের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাঁদের সেই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি পদ আরম্ভ হবার আগে চীনে ভাষায় শিল্পীর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঘোষণা করা হচ্ছিল। গানের বেলায় গানের সুর ও ভাবার্থ, বাজনার বেলায়ও সুরের নাম, কোন ঋতুতে ও কোন সময় বাজানো হয় এবং যন্ত্রটি সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত তথ্য বলে দেওয়া হচ্ছিল। নাচের বেলায় আঙ্গিক সম্বন্ধে একটু ইতিহাসের মত বর্ণনা থাকতো। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে বলে দেওয়া হোত, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কথার বিশেষ কোন প্রাধান্য নেই—শুধু সুরেরই খেলা ও মারপ্যাঁচ।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের অনুষ্ঠানগুলি চীন দেশের দর্শক সাধারণের কী রকম লেগেছে, তা'হলে বলবো আমাদের দেশের দর্শক সাধারণের যে রকম লাগে ওদেরও সেই রকমই লেগেছে। তবে কোন বিশেষ শিল্পীর কলানৈপুণ্য বিশেষ ভাবে ওদের মুগ্ধ করেছে কি-না তা' বলা আমার পক্ষে মুশকিল, কারণ ওদের হাততালি সব সময়েই সমান তালে বেজেছে। প্রত্যেক শিল্পীকেই ওঁরা সমানভাবে সমাদর জানিয়েছেন। তবে একটি কথা বলা দরকার যে, আজ নয়াচীনে মানুষকে মানুষের চরম সম্মান দেবার জন্য বিরাট অভিযান চলেছে এবং চীনের জনসাধারণ তাঁদের হৃতসম্মান ফিরে পাবার পথে বিপুল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। তাই আজ সেখানে জীবনধর্মী শিল্পসৃষ্টির প্রতি জনসাধারণের একটা সচেতন আগ্রহ যে দিন দিন বেড়ে চলেছে তার পরিচয়ও আমি পেয়েছি। এই সম্বন্ধে সুবিধামত পরে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

আমাদের অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত রাত্রি আটটায় আরম্ভ করা

হোত। প্রত্যেক শহরেই প্রথমদিন একটু বক্তৃতার আয়োজন থাকত ব'লে সেদিন অনুষ্ঠান শুরু করতে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে যেতো। পিকিং-এ প্রথম অনুষ্ঠান হল 'ইয়ুথ প্যালেস' নামে একটি বাড়িতে— এবং সেদিন সন্ধ্যে সাতটার একটু আগেই প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি মঞ্চটি জল দিয়ে মোছা হয়েছে। যদিও ভেজা নেই তবুও মঞ্চের মেজেটা একটু ভেজা ভেজা ভাব।

ল্যু-কে (এঁর পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে) ডেকে বললাম, আমাদের নৃত্য-শিল্পীদের শুধু পায়ে নাচ করতে হয়। শুক্‌নো স্টেজে দ্রুত পায়ের কাজ করার যে সুবিধে পাওয়া যায়, স্টেজটা নরম ও ভারি থাকলে ততটা সুবিধে হয় না। অতএব ভবিষ্যতে যেন আর জল দিয়ে স্টেজ না মুছে শুধু ঝাঁট দেওয়া হয়। ল্যু ভীষণ লজ্জিত হয়ে বললে— 'আমি খুব দুঃখিত, আমাদের অজ্ঞতার জন্যই এরকম একটা ভীষণ কাণ্ড হ'য়ে গেল—এখন কী উপায় হবে?' আশ্বাস দিয়ে বললাম—'কোন ভয় নেই—সময় যথেষ্ট রয়েছে, তাছাড়া যা গরম, এর মধ্যে শুকিয়ে যাবে।' আরম্ভ হবার আগেই মঞ্চ শুকিয়ে গিয়েছিল।

দুপক্ষেরই বক্তৃতা হয়ে যাবার পর সাড়ে-আটটায় আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে। উত্তম সাজ পোশাক পরে আমাদের শিল্পীরা তানপুরা হারমোনিয়াম ও তবলা নিয়ে স্টেজে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। ঘোষণার ভার ল্যু'র ওপরে। স্টেজে কাজ করবার বহু লোক—আলোর জন্য ওপরে ও নিচে বহু কর্মী, মাইক্রো-ফোনের কর্মী, পর্দার কর্মী এবং নানা ধরণের কর্মী নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে।

সবারই দৃষ্টি ল্যু-র ওপর নিবদ্ধ—সে যেখানে যাচ্ছে সমস্ত কর্মীর চোখগুলি স্পট লাইটের মত তাকে অনুসরণ করছে। কর্মীরা সবাই ঝানু—বছরের পর বছর স্টেজে কাজ করে হাত পাকিয়েছে—কিন্তু সেদিন তারা সবাই ওই একটি ছোট মেয়ের ওপর ভরসা করে আছে,

অপেক্ষা ক'রে আছে তার হাতের ইসারার জন্যে।

ল্যু-র মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর—এতোবড় দায়িত্বের কাজ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। আমাদের শিল্পীরাও সব চিন্তিত মুখ করে আছেন। পর্দার আড়ালে বেশ একটা অপূর্ব পরিবেশ। ঘোষণা শেষ হবার পর পর্দা আস্তে আস্তে স'রে যেতে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে হাততালি—ক্রমাগত হাততালি—বেশ কিছুক্ষণ চলবার পর হাততালির আওয়াজ আস্তে আস্তে থামলো। করজোড়ে আমাদের শিল্পীরা 'বন্দেমাতরম' গাইলেন—শেষ হবার পর আবার হাততালি। এইভাবে হাততালির ফাঁকে ফাঁকে আমাদের অনুষ্ঠান এগিয়ে চললো।

গান বা বাজনার শিল্পীদের অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চের মাঝখানে বড় তক্তপোষের মত কাঠের একটি বেদির ব্যবস্থা ছিল—বেদির তিনদিকে কাঠের বাক্সে ছোট ফুলগাছের টব সাজানো। এই ফুলবাগানে বসে গান বা বাজনা চলতো। নাচের সময় বেদিটা একধারে সরিয়ে বাদ্যযন্ত্র-শিল্পীরা নাচের সঙ্গে বাজাতেন।

সেদিন গোপালকৃষ্ণের নাচের পর ওর সাজপোশাক কিংবা অলংকার থেকে একটা কাঁচের টুকরো ভেঙ্গে মঞ্চে পড়ে গিয়েছিল—কারো নজরে পড়েনি—আমারও না। নাচ শেষ হ'য়ে যাবার পর হুড়মুড় ক'রে আট দশ জন কর্মী কাঠের বেদিটা মঞ্চের মাঝখানে সাজিয়ে দিয়ে গেল কারণ এর পরেই গান। পরে আবার নাচের অনুষ্ঠান হবার আগে বেদিটা সরানো হ'লো। নাচের আগে মঞ্চের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতাম এবং দেখতে গিয়ে সেই ভাঙা কাঁচের টুকরোটি পেয়ে মঞ্চের একজন কর্মীর হাতে দিয়ে ইশারায় বাইরে ফেলে দিতে বললাম। এই সামান্য ব্যাপারটি কিন্তু ওদের নজর এড়ায়নি। এর পর থেকে ওরা প্রত্যেকটি নাচের অনুষ্ঠানের আগে লাঠির ডগায় বড় একটা ব্রাশ লাগানো ঝাঁটা (নাম জানি না) দিয়ে মঞ্চটি ঝাঁট দেবার ব্যবস্থা করে ফেললো। শুধু তাই নয়—ঝাঁট দেবার পরেও সাত আট জন কর্মী

উপুড় হ'য়ে মঞ্চ পরীক্ষা ক'রে যেতো। আমি গেলে ইশারায় ওরা কি বলতো বুঝতে পারতাম না—মনে হোতো বলছে, 'আপনি ভাববেন না—আমরা দেখছি।'

কি অসম্ভব দায়িত্বজ্ঞান! ওরা এত তাড়াতাড়ি এই কাজটি শেষ করে ফেলতো যে এর জন্যে আমাদের অনুষ্ঠানের অগ্রগতি মোটেই বাধা পেত না। যতদিন চীনে ছিলাম এই ব্যবস্থা বরাবর চালু ছিল।

ওদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আর-একদিনকার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি—সেটি অবশ্য ঘটেছিল অনেক দিন বাদে সাংহাইয়ে। সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটি পদ ছিল মহীশূরের শিল্পী দেবেন্দ্রাপ্পার জল-তরঙ্গ বাজনা এবং তারপরেই একটি নাচ। আমি মঞ্চের পাশেই একটি বসবার ঘরে এক পেয়ালা কফি পান করছি। নাচের ঘোষণার আওয়াজ পাচ্ছিনা। উঠে মঞ্চের দিকে গেলাম, দেখি পর্দা ওঠানো হয়নি—মঞ্চের ওপরে পাঁচ ছয় জন কর্মী বসে কি একটা করছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম, দেবেন্দ্রাপ্পার জলতরঙ্গের বাটি থেকে সামান্য একটু জল পড়ে মঞ্চের ওপরে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় একটু ভেজা দাগ হ'য়েছে। সেই দাগটি তুলে ফেলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে কারণ এর পরে ভেজা নরম মঞ্চে নাচ হবে কি করে? সেই দাগ ওরা তুললো তবে ছাড়লো এবং পর্দা ওঠাতে প্রায় তিন মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল।

পিকিং-এর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কথাকলি নাচ দিয়ে শেষ হয়ে

গেল। সে রাত্তিরে 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' গানটি মুখস্থ হয়নি বলে বাদ দিয়েছিলাম—তাই সুরিন্দর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সবাই মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন—কে আগে দাঁড়াবেন তাই নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি হ'ল বটে কিন্তু পর্দা ফেলা ছিল বলে কেউ টের পায়নি। পর্দা তুলবার পর একদল ছোট ছেলেমেয়ে মঞ্চে উঠে একটি ক'রে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানালো—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগারে হাততালির আওয়াজ আরম্ভ হোল—হাসি—হৈ হৈ—আনন্দ ও সর্বশেষে যবনিকা পতন।

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি—মঞ্চের একজন কর্মী ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি কলা দেখাবার ভঙ্গী করে আমার দিকে দেখিয়ে একটু হাসলেন। বোকার মত আমিও হাসলাম—ভাবলাম, এতো হাততালির পর এটা আবার কি হোল! কাছেই একজন দোভাষীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম 'খুব চমৎকার' কথাটি প্রকাশ করা হয় ঐ কলা দেখিয়ে—শুনে একটু আশ্বস্ত হ'লাম। তারপর কলা দেখতে দেখতে বাসে উঠে হোটেলে ফিরলাম।

পিকিং শহরে আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান হ'য়ে যাবার পর তিন দিন সময় পাওয়া গেল এবং এই তিন দিনে বেশ কিছু দর্শনীয় দেখা হ'য়ে গেল। বাইরে কোথাও বেরুতে যাবার সময় সবাই দল বেঁধে বেরুতাম—সঙ্গে অবশ্যি দোভাষীরাও থাকতেন। ভারতীয় শান্তি

কমিটির নির্দেশ অনুসারে আমাদের জন্য চারটে মোটর গাড়ী এবং দুটো মোটর বাসের ব্যবস্থা ছিল। গাড়ী চারটির একটি আমাদের দলের নেতার জন্য, একটি কবি ভাল্লাথোল আর তাঁর ছেলের জন্য, তৃতীয়টি বিলায়েৎ হোসেনের এবং বাকীটি শ্রীমতী হীরাবাঈ ও মাস্টার কৃষ্ণন্ ব্যবহার করতেন। অন্যান্য সবাই বাস দুটোতে যাতায়াত করতেন।

কোথাও যাবার সময় বাসে উঠে বসতেই একটি দোভাষী মেয়ে বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে মুখ বার করে ওদের দলের কাউকে চেঁচিয়ে বলে দিতো 'চৃ-গা' কিংবা ওই রকমই পেছনে 'গা' জুড়ে-দেওয়া একটি ছোট কথা। ফিরে আসবার সময়েও কোন দোভাষীর গলা থেকে ঐ ধরনের 'গা' লাগানো কথার আওয়াজ শুনতে পেতাম। বার কয়েক ভাল ক'রে নজর করে বোঝা গেল ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর! পাছে আমরা কেউ হারিয়ে যাই এই ভয়ে বা'র হবার সময় মাথা-গুণতি করে নেওয়া হোত—আবার ফিরে আসার সময় মাথা গুণে আমাদের মিলিয়ে নেওয়া হোত। ওই 'গা' জুড়ে দেওয়া কথাগুলি হ'ল এক-একটি সংখ্যা।

মিছিল ক'রে শহরময় ঘুরে ঘুরে নানা জায়গা এই তিনদিনে দেখা হ'য়ে গেল। এর পরেও আরো অনেক কিছু দেখেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী ডেলিগেট ছিলেন, তাঁদের বেশ লেখার অভ্যেস ছিল—যা দেখতেন সবই ডায়েরী ক'রে লিখে নিতেন। আমিও রোজ বার হবার সময় খাতা পেনসিল নিয়ে বার হতাম বটে কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে লেখালেখি করার দরুন দেখার আনন্দের ভাগে কম পড়ে যাবার ভয়ে কিছুই লেখা হ'ত না।

২৬শে জুলাই সকাল বেলায় জানা গেল চেয়ারম্যান মাও সে তুং আমাদের দলের মাত্র পাঁচ জনের সঙ্গে সেদিনই বিকেল বেলা সাক্ষাৎ করবেন। ভাগ্যবানদের মধ্যে আছেন ১। শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, ২। কবি ভাল্লাথোল, ৩। শ্রীকলিমুল্লা খান, ৪। শ্রীবিলায়েৎ হোসেন খান

এবং ৫। শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকার। কবি ভাল্লাথোল ইংরেজী ভাষা জানেন না ব'লে তাঁর ছেলে দোভাষীর কাজ করবার জন্য যাবেন। জিজ্ঞেস ক'রে জানতে পারলাম, ভারতীয় শান্তি কমিটির নির্দেশ অনুসারেই এই ব্যবস্থাটি করা হ'য়েছে। সুতরাং দেশের সম্মানের খাতিরে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। কিন্তু মনটা ভারী দমে গেল। সেদিন রাত্তিরেই আমাদের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—চীন সরকারের নেতারা সব উপস্থিত থাকবেন—চেয়ারম্যান মাও-এর উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন খবর তখনও পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হোল 'হুয়াই জেন' হল-এ। গেল বছর এশিয়া মহাদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরীর অঞ্চলগুলির এক বিরাট শান্তি সম্মেলন এই বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল ব'লে এই বাড়ীটাকে 'হো-পিং' বা পীস হলও নাকি বলা হয়। প্রকাণ্ড বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সামনে নানা ধরনের ফুল গাছ। ভেতরে মঞ্চটিও বেশ প্রশস্ত। যথা সময়ে আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হোল এবং ঠিক আরম্ভ হবার আগে একজন দোভাষী আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে খবর দিয়ে গেলেন যে, চেয়ারম্যান মাও আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। ভাবলাম, একটু আগে খবরটা পেলে হয়তো অনুষ্ঠান আরম্ভ করবার আগে সবাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে চেয়ার-ম্যানকে নমস্কার জানাবার ব্যবস্থা করা যেতো…সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অনুষ্ঠান অনেকখানি এগিয়ে গেল। একবার ভাবলাম, মাঝে

কয়েক মিনিটের জন্য অনুষ্ঠানের কাজ বন্ধ রেখে সবাইকে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাই কিন্তু আবার মনে হ'ল আমাদের নেতাকে জিজ্ঞেস না করে এরকম একটা কিছু করা হয়তো সমীচীন হবে না। শচীনদা দর্শকদের সাথে কোথায় ব'সে আছেন জানি না—তাঁর কাছে গিয়ে যে চুপি চুপি জিজ্ঞেস ক'রে আসবো তারও উপায় নেই। কারণ দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে বলে ভীষণ তাড়াহুড়ো করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম—মঞ্চ ছেড়ে বাইরে যাবার অবকাশ হচ্ছিল না। তাছাড়া বিদেশে গিয়েছি—রাষ্ট্রের নেতাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোন আইন কানুনও জানা নেই—কিছু করতে গিয়ে অসঙ্গত ব্যাপার কিছু করে ফেলবার ভয়ও যথেষ্ট ছিল—তাই শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হল না।

সে রাত্তিরে 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' গানটি হোল। কথাকলি নাচের একটু আভাস দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে 'অবাক পৃথিবী' গানটি গাইলাম। ল্যু-কে সকাল বেলায়ই গানের ভাবার্থ বলে দিয়েছিলাম। গানটির প্রথম ভাগ শেষ হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করবার আগে মঞ্চের আলো সব লাল রঙে বদলে দেবার এবং 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে' এই কথাটি চীনে ভাষায় বলে দেবার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলাম। এদেশে এ গানটি যাঁরা জানেন বা শুনেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, গানটির প্রথম ভাগের শেষে 'সেলাম তোমাকে সেলাম' কথাগুলি গাইবার পরে এবং দ্বিতীয়ার্ধের গান ধরবার আগে মাত্র দুই বা আড়াই সেকেণ্ড সময়ের ব্যবধান থাকে। এই অল্প সময়ের মধ্যে আলো বদলাবার সঙ্কেত দিয়ে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম লাইনটি মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা কোন অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও রীতিমত কঠিন—বিশেষ ক'রে গানটি যখন বিদেশী ভাষায়। চীনে ভাষায় কোন গান হবার সময় এরকম একটি ব্যাপার যদি আমায় করতে বলা হত, আমি হলপ করে বলতে পারি যে একাজ আমার দ্বারা

হোত না। অসম্ভব—গানের কথাই তো খেয়াল রাখতে পারতাম না। সত্যিকথা বলতে কী—কাজের ভিড়ে আমার গানে ঐ আলো বদলাবার এবং ঐ ঘোষণার ব্যবস্থাটির কথা আমার নিজেরই মনে ছিল না। তাছাড়া সেদিন মনটাও খুব খারাপ ছিল—তাই আত্মভোলা হ'য়েই গানটা গাইছিলাম। হঠাৎ অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের ভেতর থেকে খুব উঁচু পর্দায় 'পাউতুং পাউতুং' দিয়ে আরম্ভ করে আরো কয়েকটি চীনে কথা ধ্বনিত হয়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঞ্চটি লাল হয়ে উঠতেই আমার খেয়াল হল—'তাইতো—এ রকমইতো কথা ছিল।' এত আচমকা ব্যাপারটি ঘটে গেল যে, গানটির দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করতে সিকিমাত্রাও লয়ের গোলমাল হয়নি। সেদিন ঐটুকু মেয়ে ল্যু সত্যি আমায় অবাক করে দিল। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ফুলের তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনার পালা শেষ হ'লে আমাদের দলের একজন মাদ্রাজী ডেলিগেট—মিঃ মূর্তি ছুটে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে আমাকে বললেন—'আশ্চর্য দাদা, আশ্চর্য! মাও সে তুং প্রথম নয়, দ্বিতীয় নয়, তৃতীয়ও নয় একেবারে চতুর্থ পংক্তিতে নীল কোট পরে সর্বসাধারণের সঙ্গে বসেছিলেন—এবং তাঁর বসবার জন্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয়নি।' আরো অনেকে এসে বললেন, তাঁরাও মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া নেবার সময় সব দর্শকদের সঙ্গে চেয়ারম্যান মাওকে দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্য করেছেন। সবার পেছনে ছিলাম বলে আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি।

সেই রাত্তিরেই 'পীস হল'-এর আরেকটি ঘরে আমাদের সম্মানার্থে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। শচীনদা আমাদের সবাইকে খবর দিয়ে গেলেন যে খাবার ঘরের দরজায় আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং তিনিও সঙ্গে থাকবেন। আমরা যেন সার বেঁধে যাই এবং কোনো কথা না বলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করি।

সময়মত আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হোল এবং শচীনদার কথামত সার বেঁধে রওনা হলাম। আমি পিছনের দিকেই আছি—এক এক ক'রে আমাদের ডেলিগেটরা ঘরে ঢুকে পড়ছেন। আস্তে আস্তে আমার পালা এলো, দরজার কাছে পৌছে দেখি, কালো গলাবন্ধ কোট প'রে চৌ এন লাই দাঁড়িয়ে—চোখ ছটো দিয়ে প্রতিভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে, হাসি হাসি মুখ, দেখে মনে হোল বয়েস পঁয়তাল্লিশের নিচে। দরজার বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে শচীনদা আলাপ করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে একটু চাপা আওয়াজে বললেন, 'প্রাইমমিনিস্টার'—কোনো কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলাম—ছোট্ট একটু ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা ক'রে দেখি উনি ছাড়ছেন না। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি না সেই বিপ্লবী গানগুলি শোনালেন?' অগত্যা কথা বলতে হোল, বললাম, 'হ্যাঁ'—আমার হাতটা আবার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'অপূর্ব লেগেছে, অপূর্ব লেগেছে—সব জায়গায় গানগুলি শোনাবেন।' ভীষণ খুশী হ'য়ে বললাম, 'নিশ্চয়, অসংখ্য ধন্যবাদ।' দোভাষীর সাহায্যে জায়গা খুঁজে নিতে বেগ পেতে হোল না।

প্রকাণ্ড ঘরে বিরাট ভোজ—তিনশোর ওপরে নিমন্ত্রিত কিন্তু সেখানে মাও সে তুং-কে দেখতে পেলাম না, বোধহয় অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। চীন গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের, পররাষ্ট্র বিভাগের এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের বড় বড় নেতারা সবাই উপস্থিত ছিলেন। পিকিং-এর প্রখ্যাত শিল্পী এবং সাহিত্যিকরাও এসেছেন। তাছাড়া ভারতের

রাষ্ট্রদূত এবং রাষ্ট্রদূতাবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন অফিসারও নিমন্ত্রিত-দের দলে ছিলেন। যথারীতি বক্তৃতাপর্ব শেষ হবার পর ভোজনপর্ব সুরু হোল। খেতে খেতে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, পরের দিন কোরিয়ার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় শিল্পীদের সম্মানার্থে স্থানীয় শিল্পীদের কিছু গান শোনাতে অনুরোধ জানালেন। হাতছানি দিয়ে নাম ধ'রে এক-একজন শিল্পীকে ডেকে এনে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে গান সুরু করতে বললেন। মাঝে মাঝে কোনো অপেরা শিল্পীকে কোনো বিশেষ অপেরার বিশেষ কোনো একটি গানের ফরমাস দিয়ে সেই গানটি শুনলেন। মাঝে একটি মহিলা শিল্পীকে ডাক দেওয়ার পর মহিলাটি তাঁর গলার অবস্থা খারাপ জানাতে প্রধানমন্ত্রী হেসে চীনে ভাষায় কি জানি একটা বললেন এবং সবাই সেই রসিকতায় যোগ দিয়ে হেসে উঠলেন। মহিলাটি সলজ্জভাবে গান আরম্ভ করলেন, কিন্তু সত্যি তাঁর গলা খারাপ ছিলো বলে গাইতে পারছিলেন না। তাঁর এই অবস্থা দেখে চৌ এন লাই নিজেই তাঁকে থামিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ধরনের ভোজ সভায় যে একটা কৃত্রিম ভদ্রতার আবরণ থাকে সেটা খসে পড়ল এবং একটা অপূর্ব ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হোল। সব চাইতে আশ্চর্য লাগলো যে প্রধানমন্ত্রী পিকিং শহরের ছোট বড় প্রত্যেকটি শিল্পীকে ব্যক্তিগতভাবে শুধু যে চেনেন তা নয়, তাঁদের সঙ্গে একটা গভীর আন্তরিকতাময় যোগসূত্র বজায় রেখেছেন! ভোজ শেষ হ'য়ে যাবার পর হোটেলে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, চৌ এন লাই প্রধানমন্ত্রী হ'য়েছেন তো সেদিন—কিন্তু প্রাক্‌বিপ্লব দিনগুলির কঠোর সংগ্রামের ভেতরেও শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই কি আজ তাঁদের চিত্ত এভাবে জয় করতে পেরেছেন?

পিকিং শহরে আমাদের বাকি ছু'টি অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমকের মধ্যেই হ'য়ে গেল। আমার মনে হয়, এই চারদিনে বড়ো জোর সাত-আট হাজারের বেশি দর্শকের আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ হয়নি। কারণ যে প্রেক্ষাগৃহগুলিতে আমাদের অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছিল সেগুলির যা আয়তন, তাতে এর বেশি দর্শকের আসনের ব্যবস্থা করা যায় না। আরো বেশি সংখ্যক দর্শকের সামনে আমাদের বিদ্যে জাহির করতে পারলাম না বলে ভারী আফ্‌শোষ হোল। খোলা মাঠে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যদি করা যেতো তাহলে হয়তো পিকিংয়ের অধিকাংশ জনসাধারণকে গান শোনাবার একটা সৌভাগ্য হোত। মনে ভারী সখ হলো এরকম একটি অনুষ্ঠান করবার। প্রস্তাবটি তত্ত্বাবধায়ক দলের নেতাদের কাছে পৌঁছে দিলাম, কিন্তু তাঁরা জানালেন যে সময়াভাবের জন্যে ঐ ধরনের ব্যবস্থা করা খুব মুশকিল, তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠন থেকেই তো প্রতিনিধি নেমন্তন্ন করে আমাদের অনুষ্ঠান দেখানো হ'য়েছে এবং এই ব্যবস্থাতে কৃষক, মজুর, সৈনিক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি সব ধরনেরই কিছু কিছু দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন। যুক্তিটা নেহাৎ ফেলে দেবার মতো নয়, কারণ সময় সত্যি ছিল না। তাছাড়া খোলা মাঠের ব্যবস্থা করতে হ'লে ছোট-খাটো মাঠে তো চলবে না; শহরের বাইরে কোনো জনসমাগমের ধাক্কা সামলানোর দায় এবং তার ব্যবস্থা করতে হ'লে প্রস্তুতির জন্যেও বেশ সময় দরকার। অগত্যা লোভ সম্বরণ করা ছাড়া আর উপায় কি? এমনিতেই আমাদের জন্য ওদের যা হয়রানি তার ওপরে আবার এই ব্যাপারে চাপ দিয়ে ওদের বিব্রত করা ঠিক মনে হোল না।

হয়রানি কি যেমন-তেমন—ভিন্ন ভিন্ন রুচির শিল্পী আমরা—পিকিং শহরে দশ দিনের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজের ভিড়ের মধ্যেও একটু ফাঁক পেলেই যার যখন এবং যেখানে খুশী বেরিয়ে পড়ছি—এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে জিনিসপত্র দেখছি আর কিনছি। কেউ হয়তো দুপুর বারোটায় বেরুলেন, কেউ বা খাওয়া দাওয়ার পরে দু'টোয়, আবার কেউ বা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সাড়ে-তিনটেয়—কোনো নিয়ম নেই, গেলেই হোল। দোভাষীরাও হাসিমুখে সদাই প্রস্তুত।

একদিন সুরিন্দর, চন্দ্রলেখা, বিলায়েৎ আর আমি বেরিয়েছি। বাজারের কাছে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করে দোকানগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছি—সঙ্গে কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে স্যাং সুয়ে লিঙ্, আমাদের দোভাষী। হঠাৎ ওরা সব একটি জামা-কাপড়ের দোকানে ঢুকে পড়ল—আমি এই ফাঁকে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ঢুকে এটা-ওটা দেখছি। ফ্যাসাদ হোল স্যাং সুয়ে লিঙ-এর। সে একবার দৌড়ে আমার কাছে আসছে আবার দৌড়ে পাশের দোকানে যাচ্ছে; তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমি কিছু কিনব না, আমার সঙ্গে থাকার কোনো দরকার নেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে—আমাদের চার জনের দায়িত্ব ওর ওপরে—ভারী ভয়, পাছে আমরা হারিয়ে যাই। ইতিমধ্যে দোকান দুটোর সামনে ভীষণ ভীড়; আমি দোকান থেকে ফুটপাতে নামবামাত্র গোল হয়ে ঘিরে সব রাস্তার লোক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। চেয়ে দেখি, ওদের কাছে সব চাইতে কৌতুকের বস্তু হোল আমার পায়ের 'স্যাণ্ডেল' জোড়াটি—আঙুল দিয়ে একজন আর-একজনকে দেখাচ্ছে—এ ধরনের চটির বোধহয় ওদেশে চলন নেই। এরি মধ্যে দেখি দুটি লোক বেশ জোর গলাতে কথা বলছে; কথাটা যে আমাকে নিয়ে সেটা বেশ বোঝা গেল। হঠাৎ ওদের একজন আমার কাছে এসে আমার পায়ের দিকে হাত দেখিয়ে চীনে ভাষায় কি জানি একটা জিজ্ঞেস করলো। কিছুই

বুঝলাম না, শুধু একটি চেনা শব্দ কানে এলো এবং সেটা হোল 'ইন্‌তো'। হিন্দি-চীনি গানের কল্যাণে 'ইনতো' কথাটির মানে 'ভারতীয়' তা' জানা ছিল। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললাম 'উ—ইন্‌তো'। ব্যাস্—চারপাশের লোক হেসে বলে উঠলো, 'ইন্‌তো' 'ইন্‌তো'। সে লোকটিও বিজয়-গর্বিত ভাবে তার বন্ধুকে আমার পায়ের দিকে তর্জনী দেখিয়ে কি জানি একটা বললো—ভাবটা যেন 'কেমন বলিনি, ওরকম চটি ভারতীয়েরা ব্যবহার করে?' এদিকে আবার কয়েকজন লোক আমাকে 'ইন্‌তো' জেনে ভীষণ খুশী হ'য়ে এসে আমার করমর্দন করে ওদের ভাষায় কি বললো এবং ওদের কথার মধ্যে 'ইন্‌তো' কথাটা বার-বার ব্যবহার করছিল। এটুকু বুঝতে পারলাম যে রাস্তার সাধারণ লোক আমাকে ভারতীয় জেনে খুব খুশী হ'লেন এবং আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে মহা ব্যস্ত হয়ে স্যাং সুয়ে লিঙ্‌ এসে আমাকে ভীড়ের মাঝখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে যেতে বললো, 'শিগগীর আসুন—ওরা সব ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স-এ যাচ্ছেন।' বললাম, 'ওটা আবার কি?' স্যাং আমায় বুঝিয়ে দিলো, 'ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স'-এর সহজ মানে হোল গভর্ণমেণ্টের মালিকানায় দোকান। এই সব দোকানে নানাবিধ দরকারী জিনিসপত্র বিক্রি হয় এবং জিনিসপত্রের দাম সব বাঁধা; এগুলি থাকাতে বে-সরকারী দোকানদারদের পক্ষে ক্রেতাদের কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করা মুশকিল, অতএব দামটা মোটামুটি একই স্তরে বাঁধা থাকে। সুরিন্দররা কিছু কেনাকাটি করলেন বটে কিন্তু বাহাদুরি দেখালো স্যাং সুয়ে লিঙ। একজন কোনো একটা জিনিস দেখতে চাইলেন, দোকানদার সেই জিনিস বের করে দাম বলবার আগেই আর-একজন স্যাংকে নিয়ে টানাটানি—সেখানে দাম-দর ঠিক হোল কি না-হোল অমনি আর-একজন স্যাংকে অন্য কোন জিনিস দেখাবার জন্ত ফরমাস দিতে বললেন—বেচারির অবস্থাটা হোল [illegible]

চেয়েও খারাপ—মাকুর তো তবু একটা বাঁধাধরা পথ আছে, কিন্তু স্যাং স্বয়ে লিঙ্‌ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে পাগলের মতো—মাঝে মাঝে আবার পিছন ফিরে আমি কোথায় আছি দেখে নিচ্ছে—সে এক দৃশ্য! এতো ঝামেলার মধ্যেও ওর মুখে হাসিটি লেগেই আছে—কোনো বিরক্তির ভাব নেই—কি অসীম ধৈর্য! শুধু স্যাং স্বয়ে লিঙ্‌ নয়, প্রত্যেকটি দোভাষীই এই স্বভাবের। একটা দিনও দেখলাম না যে কোনো দোভাষীর মুখ একটু বিষণ্ণ বা মলিন। সারাদিন আমাদের তদারক করতে করতে একটু পরিশ্রান্ত হ'তেও দেখিনি কখনো ওদের।

পিকিং-এ আমাদের ড্রেস রিহার্সালের দিন দিলীপকে ধরে এনে আমার হারমোনিয়াম ভর্তি বাক্সটা দুজনে ধরাধরি করে হোটেলের নীচে নিয়ে যাব বলে যেই আমার ঘরের বাইরে বা্র করেছি কোত্থেকে দুটি মেয়ে এসে 'করেছেন কি, করেছেন কি' বলে ছোঁ মেরে আমাদের হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিয়ে নীচে বাসে তুলে দিল। আমাদের কোনো কথাই বলতে দিল না। আর একদিন 'পীস হোটেলে'র একটি কর্ম-চারীর সাহায্যে হারমোনিয়ামটি বা'র ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সেদিনও ধরা পড়ে গেলাম। ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে মেয়েদের এরকম ভারী জিনিস ব'য়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে আমার নাকি স্টেজে অনেক কাজ তাই মাল-পত্তর টানাটানির কাজটা ওদেরই করা উচিত। যেদিনই আমাদের অনুষ্ঠান থাকতো সেদিনই ওরা আমাদের অনুষ্ঠানের সাজ-সরঞ্জাম বাদ্যযন্ত্র ইতাদি সব জিনিসপত্র ব'য়ে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে দিতো এবং ফিরিয়ে আনতো।

ওদের দেখে ভারী হিংসে হতো। কতোদিন যে আমাদের দেশের কথা ভেবেছি, তার ঠিক নেই। এরকম অদ্ভুত ছেলে-মেয়ের দল তো আমাদেরও ছিলো। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আওতায় এসে যতো ছেলে-মেয়ে কাজ করেছে তাদের উদ্যম, উৎসাহ এবং কাজ করবার

ক্ষমতা কোনো অংশেই চীনের ছেলেমেয়েদের চাইতে কম ছিল না। মনে পড়তো পার্বতী কুমারমঙ্গলম্-এর কথা, রেবা, প্রীতি ও কল্যাণীর কথা। গোপাল, অতুল প্রভৃতি কতো ছেলেই তো কি অদ্ভুত খেটেছে এই গণনাট্য আন্দোলনের জন্য! নানা শহরে ও গ্রামে আমাদের ছায়ানাট্য, 'শহীদের ডাক' দেখিয়ে বেড়িয়েছি; তু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা অবিরাম নাচের কঠোর পরিশ্রমের পরেও কল্যাণী ও রেবাকে দেখেছি আটদশজন ছেলের সঙ্গে সমানতালে আমাদের সেই বিরাট সাদা পর্দাটির কোণাগুলি ধ'রে ধুলো ঝাড়ছে এবং অন্যান্য গোছাবার কাজ সেরে নিচ্ছে। অভাব অনটনে প'ড়ে আজ তারা কেউ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, কারো 'গ্যাস্ট্রীক' ব্যারাম, কেউ বা পেটের দায়ে কাজ নিয়ে এমন জায়গায় চলে গেছেন, যেখান থেকে গণনাট্যের কাজ করা অসম্ভব। আর ওরা? ওদের দেশের ছেলেমেয়েদের আজ আর ভাত-কাপড়ের তুঃখ নেই, পড়াশুনা করার খরচ নেই, চিকিৎসার ভাবনা নেই, পেট ভ'রে খাচ্ছে আর খুশী মনে কাজ করে যাচ্ছে। চতুর্দিকে অফুরন্ত আনন্দ।

পিকিং শহরে যতগুলি রাজপ্রাসাদ দেখেছি (মোট কতগুলি আছে জানি না) প্রত্যেকটিই এক-একটি শিল্প-সৃষ্টি। এই প্রাসাদগুলির ভেতরে ঢুকে চতুর্দিকে নজর করলে প্রথমেই মনে হয় প্রাচীন চীনের মাটিতে যে শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের শিল্প প্রতিভা কী বিরাট। স্থাপত্য শিল্প, চারু শিল্প এবং আরো নানা ধরনের শিল্পসৃষ্টির অপূর্ব নমুনা সর্বত্র বিরাজিত। 'সামার প্যালেসে'র ভেতরে একটি ছাদ দেওয়া পাথরের রাস্তা ('করিডর' এর মত) প্রায় আধমাইল (বেশীও হ'তে পারে) লম্বা, তার ছাদের 'সিলিঙ'-এ প্রায় দেড়হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া ছবি আঁকা রয়েছে হাজার খানেক কিংবা তার চেয়েও বেশী। সবই নানা ধরনের পাখী ও জানোয়ারের ছবি, কিন্তু একই ছবি দুটো নেই এবং ছবিগুলিও ছবির মত ছবি। শুধু কি তাই ? দেয়ালের ভেতরে ছবি, বাইরে ছবি, ঘরের চালে ছবি—সমস্তই ছবিময়। প্রাসাদগুলির কোনটা সাতশো কোনটা হয়তো বা বারোশো বছর আগের তৈরী, ছবি-গুলির বয়সও প্রাসাদগুলির মত কিন্তু ছবির রঙ কোথাও ম্লান হয়নি, মনে হয় কয়েকদিন আগের তুলি বুলানো। সব চাইতে আশ্চর্য রকম তাজা লাগে নীল রঙে রং করা কোন জিনিস। 'টেম্‌পল অব হেভেন্' একটি বিরাট মন্দিরের মত বাড়ী—প্রাচীনকালে অনাবৃষ্টি হ'লে রাজা সেখানে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন (তাতে বৃষ্টি হ'ত কি-না কারো জানা নেই)। সেই বাড়ীটির ধারেই আরেকটি ঘরের ছাদের চারিদিক ঘিরে 'খোলা'র মত দেখতে কতগুলি পাথর গাঢ় নীল রঙ করা। কত বৎসর আগে রঙ দেওয়া হ'য়েছিল জানিনা কিন্তু এখনও রঙের উজ্জলতা পুরোমাত্রায় রয়েছে ; কয়েকশো বছরের রোদে জলেও চকচকে পালিশ ভাবটি একটুও নষ্ট হয়নি। চীনের কারিগরদের অসাধারণ প্রতিভা এবং নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্যেকটি প্রাসাদের দেয়ালে-দেয়ালে সিঁড়িতে-সিঁড়িতে। 'টেম্‌পল্ অব হেভেন্'-এর একটি উঁচু সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে একটি বিরাট চ্যাপ্টা পাথর পাতা। এই পাথরের

দু'ধার দিয়ে সিঁড়ির ধাপ—পাথরটার গায়ে মস্তবড় কয়েকটি 'ড্রাগন' খোদাই করা—খোদাই-এর কাজগুলি নিখুঁত এবং প্রত্যেকটি ড্রাগন এক রকম দেখতে। চন্দ্রলেখা নৃত্যশিল্পী হ'লেও চিত্রশিল্পে তাঁর যথেষ্ট দখল আছে—এই বিরাট সিঁড়ির অপূর্ব শোভা দেখে তিনি মুগ্ধ। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ধরনের সিঁড়ি কোথাও দেখেছেন?' আমি বললাম, 'আমি কেন—আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ দেখেছেন কি না সন্দেহ।'
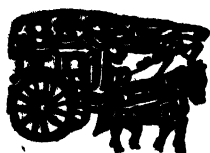
প্রত্যেক প্রাসাদেরই একটি ইতিহাস আছে—নানা ধরনের চক্রান্ত ও খুনখারাপীর ইতিহাস। সে সব ইতিহাসের খুটি নাটি তথ্য জানার আগ্রহ আমার ছিল না—তাই ওরা যখন সেই সব গল্প বলছিলো কান দিই নি। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে বিরাট প্রাসাদগুলির দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ মনটা নিজেরই অজান্তে কয়েকশো বছর পিছনে চলে গিয়েছিল। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে রঙবেরঙয়ের ব্রোকেড আর সিল্কের ঢিলে পোশাক-পরা সম্রাট ও রাজাদের ছবি—মুখে প্রবল মদমত্ততার ছাপ। রাজা যে সাধারণ মানুষের কাছে একটি ভয়ঙ্কর জীব তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন প্রাসাদের সামনের দিকে ব্রোঞ্জ-এর 'ড্রাগন' কিংবা সিংহ বসানো। 'ড্রাগন' কোন সত্যিকারের জীব কি-না আমার জানা নেই—হয়তো ভয় দেখাবার জন্যেই এই নামের একটি কাল্পনিক জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই ব্রোঞ্জ-এর সিংহগুলি কিন্তু আলীপুরের চিড়িয়াখানার সিংহের মত নয়। জ্যান্ত সিংহের

চেহারায় কেমন জানি একটা 'দাদামশাই দাদামশাই' ভাব আছে—চোখে একটু নিদ্রালু ভাব—মুখখানা ভ্যাংচানো অবস্থায় না থাকলে ওদের কেশরে হাত বুলিয়ে আদর করবার লোভ হয়। কিন্তু চীনের ব্রোঞ্জ-এর সিংহের মুখে চরম বীভৎসতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—দেখলেই ভয় হয় এই বুঝি কেউ অতর্কিতে পিঠে ছুরি বসিয়ে দিল। কী অপূর্ব কৌশলেই সাবেক কালের চীনের শাসক এবং শোষক গোষ্ঠী নিজেদের কাছ থেকে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখতো! শোষক ও শোষিতদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করতে পারলে অবাধ শোষণের কাজ চলে না—তাই মানুষ তার দুঃখ ও বেদনার কথা রাজার কানে যাতে পৌঁছে দিতে না পারে তার জন্য নানান কায়দায় মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক ক'রে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে এই সব ব্যবস্থা করতে হোত। রাজপ্রাসাদগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ জানবার আগ্রহ ছিল না বটে কিন্তু যখনই ঐ বিরাট মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়েছি চীনের জনসাধারণের ব্যথার ইতিহাস আপনাআপনি মনে জেগে উঠেছে—মনে হয়েছে শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষ কি নিষ্ঠুর অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে এই প্রাসাদগুলির মালিকদের হাতে!

আজ ভোল্ পাল্টেছে, 'সামার প্যালেসের' ভেতরে একটা নাটমণ্ডপের মত ঘরে দেখি কাতারে কাতারে লোক বিছানা পেতে শুয়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার কেউ শুয়ে শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে ধূমপান করছে। এঁরা 'আদর্শ শ্রমিক' (মডেল্ ওয়ার্কার)—কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বলে রাজপ্রাসাদে কয়েকদিন আরাম করবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে এঁদের জন্যে। ওঁরা চলে গেলে আবার আরেকদল আসবে। তাছাড়া বহু পরিবার এসেছেন বেড়াতে, পিক্‌নিক করতে—ছেলেমেয়েরা এটা দেখছে ওটা দেখছে, ছুটোছুটি করে খেলছে, গান গাইছে। মুক্তি-ফৌজের যোদ্ধারাও এসেছেন ছুটি পেয়ে। এঁরা যে সবাই পিকিংএর তা' নয়—অনেকে অন্য প্রদেশ থেকেও এসেছেন। ছোট ছোট খাবারের

দোকান, চায়ের দোকান প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। মনে হ'ল একটা আনন্দের মেলা ব'সেছে—সমস্ত আলো বাতাস খুশীতে ভরা। আনন্দ আজ আর দেশের কয়েকটি বাছাই করা লোকের জন্যে নয়—কিছুদিন আগে জীবনের সব আনন্দ থেকে যারা বঞ্চিত ছিল তারা আজ সবাই জুটেছে এই আনন্দ-যজ্ঞে—সমস্ত দেশটা আনন্দে মেতে উঠেছে।

'পেহাই পার্ক' ছিল রাজা উজীরদের প্রমোদোদ্যান—সাত হাজার একর ভূমি জুড়ে এই বাগানবাড়ী—অর্ধেকের সামান্য বেশী অংশ 'লেক্' বা বিরাট পুকুর ; একধারে একটি ছোট পাহাড়—পাহাড়ের চূড়ায় সাদা রং-এর লামা মন্দির। পাহাড়ের একদিকে লেকের দিকে মুখ করে একটি বিরাট বাড়ী—রাজাদের ফুর্তি করবার জায়গা ; ইচ্ছে হ'লে নীচে নেমে নৌকা বিহারও চলতে পারে। লেকের আরেকটি ধারে পাঁচটি ঘর (প্যাভিলিয়ান) ; ঘরগুলি জলের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে—এখানে রাজারা মন্ত্রীসমভিব্যাহারে সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্তিরে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় শরীর ও মন একটু চাঙা ক'রে নিতেন। বলা বাহুল্য, এসব জায়গায় সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কুয়োমিণ্টাং-এর কর্তৃত্বে 'চিং' বংশের শেষ রাজার রাজত্বের অবসান হবার পর অবশ্যি এই বাগান বাড়ীতে প্রবেশাধিকার সর্বসাধারণকে দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু সংস্কারের অভাবে যত শেয়াল, বিষাক্ত সাপ, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ ও মশা বাসা বেঁধেছিল ব'লে পেহাই পার্ক সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য ছিল না।

চীনে নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পেহাই পার্কের বর্তমান চেহারা যা দেখলাম তা বলে বোঝানো যাবে না। পেহাই পার্ক সর্বসাধারণের সম্পত্তি হলেও আসলে কিন্তু তা' নয়—এর আসল মালিক হ'ল চীনদেশের বাচ্চারা। বড় ছোট মাঝারি সব ধরনের বাচ্চাদের আনন্দের জন্য, তাদের প্রতিভার বিকাশের জন্য যত ব্যবস্থা হতে পারে সবই এই পার্কে আছে। বিভিন্ন ধরনের দোলনা, নাগর-দোলা জাতীয় আরো নানা রকম 'দোল' খাবার সরঞ্জাম, ছুটোছুটি করবার মাঠ—মানে ছোট বাচ্চাদের আনন্দ দেবার যত উপকরণ সম্ভব সবই বহুসংখ্যায় এই পার্কে রাখা আছে। 'ইয়ং পাইওনিয়ার্সের' জন্যে তিনটে বাড়ী—এই তিনটে বাড়ী একটি উঁচু টিলার ওপর অবস্থিত—রাজারা ব্যবহার করতেন ব'লে সিঁড়ি ছোট ছোট ধাপে তৈরী—কারণ বড় বড় ধাপ থাকলে রাজাদের উঠতে নামতে কষ্ট ও পরিশ্রম হ'তে পারে। বাচ্চারা সেই সুবিধেটি পাচ্ছে। এই তিনটি বাড়ীর একটিতে বাচ্চাদের গান বাজনা শিখবার ও অভ্যাস করবার জন্যে যত রকম বাদ্য-যন্ত্র সম্ভব সবই রাখা আছে; আরেকটি ব্যবহার করা হয় ছবি আঁকা ও কাদার মূর্তি গড়ার কাজের জন্যে। তৃতীয়টিতে টেবিল টেনিস, ক্যারম্ প্রভৃতি যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম রয়েছে। আমরা যখন ওই বাড়ীতে পৌঁছেছি তখন এক দলের বাজনা অনুশীলন শেষ হ'য়ে গেল, তারা বাজনাগুলি বাক্সবন্দী করে বেরিয়ে যাচ্ছে—হয়তো তখন দুপুরের খাওয়ার সময় হ'য়ে গিয়েছিল। ছবির ঘরে দেখলাম অসংখ্য কাঁচা হাতের ছবি, ভবিষ্যতে এই হাতই পেকে ঝুনো হবে। কয়েকজন শিল্পী তখন কাদা নিয়ে কাজ করছিল, তাদের বয়েস বারো কি তেরো। মুখগুলি অসম্ভব গম্ভীর করে নরম মূর্তিগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কচি কচি আঙুল দিয়ে টিপে ঘষে কি জানি কি একটা করতে চেষ্টা করছিল। দেখতে ভারী মজা লাগছিলো।

পেহাই পার্কে ঢুকেছিলাম যে দরজা দিয়ে, ফিরে আসার সময় কিন্তু

সে দরজা দিয়ে বা'র হইনি। অন্য একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম কারণ আমাদের দলের সবাই তখনো বা'র হন নি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ্য করলাম, বয়স্ক লোকদের টিকিট কিনে পার্কে ঢুকতে হচ্ছে—দর্শনীর হার অবশ্যি খুব কম—তিন চার পয়সার বেশী নয়। বাচ্চাদের কোন টিকিট দরকার হয় না। তখনই বুঝলাম, বাচ্চারাই হ'ল পেহাই পার্কের আসল মালিক, এই পার্কে তাদের অবাধ অধিকার। তাদের মা-বাবারাও আসতে পারেন কিন্তু এত বড় পার্কের খরচ চালাবার দায়িত্বের একটু ভার মা-বাবাদের নিতে হবে বৈকি!

বাচ্চাদের প্রবেশ করবার পদ্ধতির মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। সাড়ে-তিন ফুট-এর মত লম্বা একটি কাঠ মাটিতে দাঁড় করানো আছে—কাঠের ডগায় মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আরেকটি কাঠ লাগানো। এই কাঠের তলা দিয়ে যে সোজা হ'য়ে গলে যেতে পারবে, তার টিকিট লাগবে না। পার্কের একজন কর্মী বাচ্চাদের দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছেন। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্মীটির কাজ লক্ষ্য করছিলাম। একটি ছোট ছেলে ভেতর থেকে এসে হঠাৎ ওঁকে কি বললো; কথা না বলে কর্মীটি শুধু মাথা নাড়লেন। ছেলেটি বাইরে এসে রাস্তার একজন আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে একটি আইসক্রিম কিনে খেতে খেতে আবার যেই ঢুকতে গেছে, খপ্ করে ওর একটি হাত ধরে ফেললেন কর্মীটি। আমার কিন্তু ভারী রাগ হ'য়ে গেল ব্যাপারটি দেখে। ওঁর কাছে অনুমতি নিয়েই তো ছেলেটি বেরিয়েছে—তবে? নিজের দেশ হ'লে একটা বচসা সুরু করে দিতাম—কিন্তু ওখানে কী বলবো? কিছু বললে তিনি তো কিছু বুঝবেন না—আর ওঁর কথাও আমার বোধগম্য হবে না। তাই চুপ করে দেখছিলাম ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। ছেলেটির হাত ধরে ধীরে ধীরে তিনিই আইসক্রীমের গাড়ীর কাছে নিয়ে গেলেন, নিজের হাতে উপুড়

হ'য়ে আইসক্রীমের কাগজের খোসাটি রাস্তা থেকে তুলে গেটের পাশে আবর্জনা ফেলবার বাক্সে ফেলে দিয়ে ছেলেটিকে কি জানি বোঝালেন। তাঁর গলার আওয়াজে ভর্ৎসনার সুর ছিল না। ছেলেটি মাথা নেড়ে আবার পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লো। পার্কের একজন 'গেটম্যান' কী বা তাঁর বিদ্যে বুদ্ধি ; কিন্তু এই বুদ্ধি দিয়েই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার কাজে তিনি যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলেন তার তুলনা হয়তো শুধু ওদেশেই মেলে।

একদিন পিকিং শহরের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে খানা পিনার ব্যবস্থা হোল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের বাড়িতে। চমৎকার বাড়ি—আধুনিক ফ্যাসানের আরামদায়ক ব্যবস্থা সবই রয়েছে, সাঁতার দেবার জন্যে সুইমিং পুলটিও বাদ নেই। সেদিন চীনের বড় বড় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাবেশ হয়েছে—আমরাও বিদেশ থেকে এসেছি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে—অতএব এরকম একটি ঐতিহাসিক সমাবেশে ভাবের আদান-প্রদান হওয়া নিতান্তই দরকার। তাই ঠিক হোল, আমরা তিনভাগে বিভক্ত হ'য়ে আলাপ-আলোচনা করব। উভয় দেশের গানবাজনার শিল্পীরা একজায়গায় এবং সাহিত্যিকরা আর একটি জায়গায় ব'সে আলোচনা শুরু করলেন। নৃত্যশিল্পী ও সাহিত্যিকদের আসর কি ধরনের হল আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ আমি ছিলাম গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে। আমাদের আসরে ওঁদের পক্ষ থেকে এসেছেন

বেশ নাম-করা প্রবীণ ও নবীন 'অপেরা' শিল্পী কয়েকজন, তাছাড়া বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েরাও আছেন। সবার অনুমতি নিয়ে আলোচনার কাজ শুরু করলাম আমি। চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ওদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ কিভাবে চলত, সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম।

মিঃ ল্যু-চি (তৎকালীন 'অল চায়না এসোসিয়েশন অব মিউজিক ওয়ার্কস'-এর সভাপতি) ওদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে বহুদিন থেকে জড়িত। তিনি উঠে দাঁড়ালেন আমার প্রশ্নের জবাব দিতে। চেয়ারে ব'সে বলতে অনুরোধ করায় উনি বসেই বলতে শুরু করলেন।

প্রথমে চীনের প্রথম বিপ্লবের পর ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিস্টরা একসঙ্গে মিলে কিভাবে কাজ করতেন, তার গল্প শোনালেন। তারপর ১৯২৭-এর এপ্রিল মাসে কুয়োমিণ্টাং বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসের উল্লেখ করে কি করে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির ওপর নানাধরনের হামলা ক'রে সংগঠনগুলিকে ভেঙে তছনছ করে ফেলবার চেষ্টা চলতে লাগল তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। কুয়োমিণ্টাংএর প্রচণ্ড দমননীতি অগ্রাহ্য করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা কি অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে তাঁদের আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতেন তার কাহিনী শুনে অবাক হ'য়ে যাচ্ছিলাম। কমিউনিস্ট ও কুয়োমিণ্টাং মিতালীর কালে যে সব দেশাত্মবোধক ও প্রগতিমূলক গানের চলন ছিল, ১৯২৭-এর পর সেই গানগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল গান ব'লে অভিহিত ক'রে বে-আইনী করে দেওয়া হোল। প্রগতির গান অথবা নাটক করার অপরাধে চরম শাস্তি পেতে হোত বলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

কুয়োমিণ্টাং-এর পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁরা যেভাবে কাজ করতেন তার দু'একটা নমুনাও শোনালেন মিঃ ল্যু-চি। শিল্পীরা গ্রামে,

শহরে কারখানার শ্রমিকদের গান শেখাতেন—দেশাত্মবোধক ও বিপ্লবী গানের সঙ্গে জনপ্রিয় প্রেমসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতও শেখানো হোত। বিপ্লবের গানগুলি অভ্যাস করা হোত খুব চাপা আওয়াজে—ঘরের বাইরে নিজেদের লোক থাকত পাহারা দেবার জন্যে। পুলিস বা সন্দেহজনক কোন ব্যক্তির উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবের গানের কাগজগুলি লুকিয়ে, গলা ছেড়ে প্রেমের গান আরম্ভ হ'য়ে যেতো। নিরীহ প্রেমসঙ্গীত গাইবার অধিকার সকলেরই আছে; পুলিসের লোক টহল দিয়ে দেখে যাবার পর 'অল ক্লিয়ার' সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিপ্লবের গান। এই লুকোচুরি খেলার ভেতর দিয়ে আন্দোলনের কাজ চলতে লাগল। সবচাইতে বিপদ হোত স্কুলের মাস্টার মশাইদের। বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত মাস্টার মশাইরা ক্লাস নেবার সময় ছাত্রদের মনে বিপ্লবের বীজ বুনে যেতে লাগলেন। ক্লাসেও দরজা বন্ধ ক'রে চাপা গলায় ছাত্রদের স্বদেশী গান শেখানো হোত। এই কাজে কত শিক্ষক যে ধরা পড়েছেন ও শাস্তি পেয়েছেন তার কোনো হিসাব নেই। শিক্ষকদের ছিল সবচাইতে বেশী বিপদ কারণ অন্যান্য জায়গায় যে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করা হোত সেই ধরনের সুবিধে শিক্ষকদের ছিল না, কিন্তু তাই বলে মন্ত্র দেবার কাজ কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি।

কারখানার শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়নের মধ্যেও সাংস্কৃতিক কর্মীরা গোপনে গোপনে ঢুকে প'ড়ে নতুন সাংস্কৃতিক কর্মী তৈরী করার কাজ শুরু ক'রে দিতেন। শ্রমিকরা ছুটির দিনে চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করতেন শহরের বাইরে কোনো জায়গায়, যেখানে পুলিসের দৌরাত্ম্য থাকত না। সেখানে সবাই মিলে বিপ্লবাত্মক গান শিখতেন ও গাইতেন। এইভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মীর দল তৈরি হবার কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল।

মিঃ ল্যু-চি'র পুরানো দিনের গল্পগুলি বেশ জমে উঠেছে—কিন্তু

আগেই বলেছি ভিন্ন ভিন্ন রুচির শিল্পী আমরা—এই ধরনের গল্প সবার ভাল লাগবে কেন? একজন ডেলিগেট তো স্পষ্টই আমাকে হিন্দীতে বললেন যে, এই আলোচনা সকলের পছন্দসই হচ্ছে না এবং অন্যান্য ডেলিগেটরা চীন দেশের 'ক্ল্যাসিক্যাল' সঙ্গীত সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। কাজে কাজেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ চাপা দিতে হোল।

বিলায়েৎ হোসেন খান 'ক্ল্যাসিক্যাল' শিল্পীদের মুখপাত্র হ'য়ে কত ধরনের 'ক্ল্যাসিক্যাল' সঙ্গীত চীনে আছে, জানতে চাইলেন। জানা গেল ওঁদের তিন ধরনের 'ক্ল্যাসিক্যাল' সঙ্গীত। একধরণের নাম কুনচু—সাধারণত বাঁশী বাজিয়ে এই সঙ্গীতচর্চা করা হোত, দ্বিতীয় ধরনেও বাঁশী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হোত এবং সাধারণত মন্দির বা দেবালয়ের কাজে ঐ ধরনের সঙ্গীত আবদ্ধ ছিল। এই দুই ধরনের সঙ্গীতের ওপর ভারতীয় প্রভাব যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তার প্রমাণও নাকি তাঁদের কাছে আছে। এ ছাড়া বহুদিন আগে আর এক ধরনের সঙ্গীত প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে তার কোনো চর্চা নেই। এরপর আমাদের শিল্পীরা চীন দেশের সঙ্গীতের 'তাল' সম্বন্ধে কিছু খবর জানতে চাইলেন এবং সেই সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানবার পর ওঁদের কিছু গান শুনে আমাদের আসর ভাঙলো।

আসর ভেঙে যাবার পর মিঃ ল্যু চি'র দোভাষীর কাজ করছিলেন যে ভদ্রলোক তাঁকে গিয়ে বললাম, মুক্তি ফৌজের যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পীরা কাজ করতেন তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার দেখা করবার খুব সখ এবং তাঁদের মুখ থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। ভদ্রলোক আমার নাম ওঁর খাতায় টুকে নিলেন এবং আশ্বাস দিয়ে বললেন যে মিঃ ল্যু চি'কে জানিয়ে এর একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন।

এরপরেই পিকিং-এর 'অ্যাক্রোব্যাট'দের কসরৎ দেখানো হোল। এবিষয়ে বলবার মতো কিছুই নেই কারণ বাংলা দেশে চীনে অ্যাক্রো-

ব্যাটদের অনুষ্ঠান অনেকেই দেখেছেন এবং তাঁদের পারদর্শিতার কথা সবাই জানেন। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন একটি সার্কাসের দল এসেছিল আমাদের দেশে এবং এই সার্কাসের দলে কয়েকটি চীন দেশের ছেলে অ্যাক্রোব্যাটিক খেলা দেখাতো। আমার বেশ মনে আছে, যে ক'দিন দলটি ওখানে ছিল রোজ সকালে ওদের আস্তানায় গিয়ে ছেলে-দের অনুশীলনের কাজ অবাক হ'য়ে দেখতাম। এবার পিকিং-এর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কসরৎ দেখে আরও বেশী অবাক হ'য়ে গেছি এবং সাংহাই-এ যা দেখেছি তা বললে এ দেশের কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। একটি দড়ির প্যাঁচএর গল্প বলছি—যিনি খেলাটি দেখালেন তাঁর বয়েস ষাটের কাছাকাছি—'স্কিপিং রোপ'-এর মতো একটা দড়ি দিয়ে কলসীর মতো দেখতে কাঠের একটি বস্তুর গলায় পেঁচিয়ে তাকে লাট্টুর মতো ঘোরালেন—দড়ির ওপরে নানারকম লোফালুফি খেলা দেখালেন। হঠাৎ খেলোয়াড়টি স্টেজের পেছন দিকে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে কাঠের কলসীটি দড়ির ফাঁস ছেড়ে গড়গড় করে ঘুরতে ঘুরতে স্টেজের সামনের দিকে আসতে লাগলো—ফুটলাইট পর্যন্ত এসে কলসীটি আবার পেছন দিকে ঘুরতে শুরু করলো। খেলোয়াড়টি কিন্তু তখনো শুয়ে আছেন এবং তাঁর দড়ির একটি দিক স্টেজের ওপরে রেখে অন্যদিকটা ওপরের দিকে তুলে রেখেছেন। কলসীটি গড়াতে গড়াতে আবার সেই দড়ির ওপরে সোজা উঠে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়ও উঠে দাঁড়ালেন। বিশ্বাস হয়? নিজে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না।

পিকিং-এর স্কুল-কলেজ দেখবার কথা ছিল ২৭শে জুলাই তারিখে; কিন্তু তখন গরমের ছুটি ছিল বলে সব বন্ধ, তাই ঠিক হোল সেদিন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখব। শহর থেকে একটু বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটি। ভেতরটাতে শান্তিনিকেতনের মতো আশ্রম আশ্রম ভাব। বড় বড় গাছপালা আছে আবার ছোট ছোট ফুলগাছের ঝোপও রয়েছে—ছোট ছোট ফুলগাছের বেড়ার পাশ দিয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে এবাড়ি ওবাড়ির গাঁ ঘেষে চলে গেছে। শান্তি-নিকেতনের ছাতিমতলার শান্তিপূর্ণ পরিবেশটি পুরোমাত্রায় রয়েছে। সমস্ত এলাকাটা বেশ গোছানো, পরিষ্কার, পরিপাটি—একটা ছিমছাম ভাব। অনেকগুলি পাকা বাড়ি—টালির ছাদ—অনেকটা কলকাতার বাইরে পুরানো দিনের ক্রিশ্চিয়ান গির্জেগুলির মতো দেখতে।

আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য একটি ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, হঠাৎ দেখি ওঁদের দলের একজন হিন্দুস্থানী ভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা করছেন। তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের রাশিয়ার একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁকে নাকি একটি রুশ ছেলে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় 'দাত্ব' ব'লে সম্বোধন ক'রে পায়ে ধ'রে প্রণাম করে এবং বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা ব'লে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। চীনে এসে ঐ ভদ্রলোককে আমাদের রাষ্ট্রভাষা-ভাষী শিল্পীদের সঙ্গে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলতে দেখে আমার তক্ষুণি মনে হোল আবার বুঝি সেই ধরনের একটি ঘটনা ঘটলো। ভদ্রলোকটির কাছে গিয়ে আপাদমস্তক দেখে নিলাম—চেহারায় কোথাও চীন দেশের গন্ধও নেই—গায়ের রং আমাদেরই মতো—বেহারী কায়দায় খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী পরা। ওঁকেই জিজ্ঞেস করে জানলাম উনি আমাদেরই দেশের লোক—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন—নাম শ্রীভানুচন্দ্র শার্মা। শুনে ভারী মজা লাগলো। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছি, হঠাৎ একটি ছেলে এসে হিন্দীতে

বললো, 'নমস্তে—আপ আচ্ছা হ্যায় ?' অবাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি একেবারে নিখুঁত চীনে মুখ—ভুল করবার উপায় নেই—তাছাড়া উচ্চারণ ভঙ্গীও তেমন পোক্ত হয়নি, অনেকটা আমার হিন্দীর মতো। ওকে দেখে আমার আরও মজা লেগে গেল। আমার বাঙ্গালী-হিন্দী ভাষায় হেসে জবাব দিলাম, 'হাঁ-জী বহুত সুক্রিয়া—আপ আচ্ছা হ্যায় তো ?' শ্রীভার্মাকে বললাম, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো ?' উনি হেসে বললেন, 'ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়—হিন্দী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাতচল্লিশ জন ছাত্র হিন্দী শিখছে।' ছেলেটি আমাদের দেখে ওর নিজের হিন্দুস্থানী জ্ঞানটি একটু ঝালিয়ে নিল। শ্রীভার্মাই ওখানে হিন্দী ভাষার প্রোফেসার।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি প্রোফেসার টং আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। পলিতকেশ বৃদ্ধ প্রোফেসার টং চীন বিপ্লবে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অল্প সময়ের মধ্যে বলে দিলেন। সেদিনই জানতে পারলাম কি দুর্ধর্ষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের সঙ্গে মিলে তুমুল ঝড় ও ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে চীন বিপ্লবের ঐতিহ্য তৈরী করে গিয়েছেন এবং সেই ঐতিহ্য বহন করে এনেছেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর থেকে চীনের বিপ্লবের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হ'তে লাগলো এবং সেই ইতিহাসের সঙ্গে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হ'য়ে পড়েছিল। কেনই বা হবে না ? বিপ্লবের আসল নেতা মাও সেতুং তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর একজন কর্মী। তাছাড়া লী তা-চাও (চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) ও লু শুন-এর মত একজন বিরাট বিপ্লবী সাহিত্যিক (মাও সেতুং এঁকে 'নন-পার্টি বলশেভিক' আখ্যা দিয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করতেন। এইসব

জাঁদরেল নেতাদের সাহচর্যে ও পরিচালনায় পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এবং চিয়াং কাইশেকের নৃশংস ও বর্বর শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি শক্ত ঘাঁটি হ'য়ে উঠেছিল। এই বিরাট আন্দোলনে প্রগতিপন্থী ছাত্রের দল জনসাধারণের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে আন্দোলনের কাজ করেছেন। তখনকার চীনে অবশ্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির সবই চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তাদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে প্রভুভক্ত প্রহরী এবং চীনের জনসাধারণকে সায়েস্তা করার জন্যে উপযুক্ত লাঠিয়াল তৈরী করবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভারও তাদের নিজেদের হাতে ছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছলে বলে কৌশলে কী করে যে বিপ্লবী আন্দোলন চালানো হোতো ভাবলে আশ্চর্য হোতে হয়। বিপ্লব শেষ হবার পর ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জনসাধারণের ইচ্ছামত গড়ে তুলবার কাজ অনেক সোজা হ'য়ে গিয়েছিল। এই তিন বছরে সংস্কারের কাজ কতখানি এগিয়েছে তার ফিরিস্তী প্রোফেসর টং-এর মুখে শুনলাম।

পুরানো চীনে শাসকগোষ্ঠী ও বিত্তশালীদের সন্তানদেরই শুধু উচ্চশিক্ষা লাভ করবার অধিকার ছিল। নির্যাতিত চাষী মজুরের সন্তানদের এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোন প্রকার শিক্ষার অধিকার ও ব্যবস্থা ছিল না। ছেলেদের যেটুকু বা ছিল মেয়েদের তাও ছিল না। নতুন ব্যবস্থার ফলে চাষী ও মজুরের ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ করবার সুযোগ ও সুবিধে পেয়েছেন। চাষী ও মজুরের ছেলেমেয়েদের জন্য একরকম নতুন ধরনের মধ্য বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করা হ'য়েছে এবং এইসব বিদ্যালয়ে নতুন এক শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সব ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থাপনায় আজ পিকিং

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রদের সংখ্যার শতকরা বারো ভাগ চাষী ও মজুরের সন্তান ; আগে কিন্তু একটিও ছিল না। ছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা আঠাশ ভাগ। আঠারোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রায় একশো ছেলেমেয়ে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছেন। তাছাড়া বিদেশ থেকে চীনে এসে অধ্যয়ন করছেন প্রায় একশো ছাত্র। এঁদের কেউ এসেছেন কোরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া থেকে, আবার কেউ বা এসেছেন রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানী থেকে। এইরকম বিদেশী ছাত্রের আমদানী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম।

বিপ্লব হবার আগে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছরে প্রায় দুই-হাজার ছাত্রকে গ্রাজুয়েট হ'য়ে বেরিয়েই বেকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হোতো। আজ আর সেদিন নেই। আজ চীনের সর্বত্র গঠনমূলক কাজ এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে বছরে প্রায় সাড়ে-চার হাজার গ্র্যাজুয়েট তৈরী করেও শিক্ষিত লোকের ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। গত তিন বছরে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে যত ছাত্র বেরিয়েছেন প্রত্যেকটি ছাত্রই দেশের দরকারী জায়গামতো এবং তাঁদের মেধা-উপযোগী কাজে নিযুক্ত হ'য়ে পড়েছেন—একজনও বেকার হ'য়ে নেই। তাঁদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য সমস্ত সুবিধে করে দেওয়া হ'য়েছে এবং তাঁদের শক্তির ওপর পুরো বিশ্বাস আছে বলেই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের পুরো দায়িত্ব ওঁদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রমাণ তো আমি নিজেই পেয়েছি। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে ল্যু ওয়ান জু সবেমাত্র গ্রাজুয়েট হ'য়ে বেরিয়েছে। চীনে দেড় মাস আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নানা শহরে ঘুরতে হয়েছিল। স্টেজের কাজের সমস্ত দায়িত্ব ওইটুকু মেয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। ওর কোন উপরওয়ালাকে অথবা ওদের দলের কোন নেতাকে ওর কাজ পর্যবেক্ষণ করতে কিংবা স্টেজে এসে কাজ

সম্বন্ধে কোন পরামর্শ দিতে একটি দিনও দেখিনি। ল্যু আমাদের সুবিধেমত কাজ করতে পারছে কি না সে সম্বন্ধেও ওদের নেতারা কোন প্রশ্ন একদিনও আমাকে করেন নি কারণ তাঁরা জানতেন যে বিশ্বাস ক'রে যে দায়িত্ব ল্যু'র ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সে তা নিখুঁত ভাবে পালন করবেই।

এই তিন বছরে চীনের শিক্ষাপদ্ধতির ও শিক্ষণীয় বিষয়ের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বারোটি ডিপার্টমেন্টে বারোটি বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে—গণিতশাস্ত্র ও মেকানিক্স, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভূগোল শাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, চীনের ও রুশ দেশের ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচ্য প্রতীচ্য ভাষা এবং সাহিত্য। ভবিষ্যতে বাংলা ও তামিল ভাষা শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাও ওঁদের আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করে প্রোফেসর টং বললেন যে, চীনের জাতীয় সংগঠনমূলক কাজে সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্ত দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, চীনের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের ব্যাপারেও সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া এত দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হোতো না। সোভিয়েটের অভিজ্ঞতা নিজেদের দেশের কাজে লাগিয়ে আরো বেশী লাভবান হবার উদ্দেশ্যে সেখানকার মাস্টার মশাইরা রুশীয় ভাষা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করবার জন্যে দলে দলে উঠে পড়ে লেগেছেন। চীন সরকার শিক্ষকদের সব প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন—ছাত্রদের শিক্ষার খরচও সরকার থেকেই বহন করা হচ্ছে।

দেশ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানকে উন্নততর স্তরে তুলে ধরতে হবে। তাই সমস্ত দেশের লোককে মানুষ করে গড়ে তুলবার কাজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষক আজ বদ্ধপরিকর।

চ্যাং চিয়াং-চুয়ান্ গ্রামে একদিন লণ্ঠন-উৎসব। গ্রামের সবাই এসেছেন এই উৎসবে আনন্দ করতে। কাঠের মিস্ত্রী চ্যাং ও তার স্ত্রী শ্রীমতী শিয়াও ফি-উও'র একমাত্র কন্যা শ্রীমতী আই-আই এসেছে শিয়াও ওয়ানের সঙ্গে দেখা করবার আশায়। শিয়াও ওয়ান্ হল অল্পবয়স্ক চাষী—তার সঙ্গে আই-আই'এর গভীর প্রেম। ওদের প্রেমের খবর গাঁয়ের প্রবীণদের কানে পৌঁছেছে কিন্তু তাঁরা মোটেই আমল দেন না। প্রেম টেম করা চলবে না গাঁয়ে থাকতে হ'লে, গাঁয়ের মাতব্বরদের কথামত চলতে হবে। ওখানকার নিয়ম হ'ল গাঁয়ের প্রধানের সুপারিশ ছাড়া কোন বিয়ে হবে না—প্রধানের আবার আই-আই'এর সঙ্গে নিজের ভাইপোর বিয়ে দেবার একটা গোপন অভিসন্ধি আছে—অতএব আই-আই এবং শিয়াও ওয়ানের বিয়ের অনুমতি হবার নয়। কিন্তু না হ'লে কী হবে? সেই উৎসবের রাত্তিরে দু'জনে দেখা করে সব পাকাপাকি ক'রে ফেললো। আই-আই শিয়াওকে একটি আংটি দিল আর শিয়াও দিল একটি বৌদ্ধ মুদ্রা। উৎসবের শেষে বাড়ি ফিরে আই-আই ঘুমিয়ে পড়েছিল—হাত থেকে কখন যে বৌদ্ধ মুদ্রাটি খাটের নিচে পড়ে যায়, টের পায়নি। আই-আই'এর মা মুদ্রাটি কুড়িয়ে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ওঁর নিজের জীবনেও

নাকি এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল বহুদিন আগে—ঠিক এই ধরনের একটি বৌদ্ধ মুদ্রা তাঁকেও একজন দিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ে হোল চ্যাং-এর সঙ্গে। চ্যাং যেদিন শুনতে পেল যে ওর স্ত্রী আরেকজনকে ভালবাসতো সেদিন স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছিল। আই-আই'এর মা'র ভয় হোল তাঁর মেয়ের ভাগ্যেও যদি ওরকম দশা ঘটে তাহলে কী উপায় হবে! তাঁর ঐ কচি মেয়ে কি ঐ ধরনের নির্মম অত্যাচার সইতে পারবে? মায়ের বুকফাটা কান্না দেখে মনে হচ্ছিল কী অসহায় বোধ করছিলেন তিনি। কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ইতিমধ্যে চ্যাং-এর কানেও নাকি মেয়ের কেচ্ছার কথা পৌঁছে গেছে—তার ভাবনা আবার অন্য রকম। মেয়ে যদি কোন কেলেঙ্কারী করে বসে তাহলে তার পারিবারিক মর্যাদা ভীষণ ক্ষুণ্ন হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কায় চ্যাং তার এক আত্মীয়ার কাছে আই-আই'এর বিয়ে ঠিক করে ফেলবার অনুরোধ করল। আত্মীয়াটি আবার গ্রামের প্রধানের গোপন অভিসন্ধির খবরটি পেয়েছিল। তাই আই-আই'এর মাকে নিয়ে প্রধানের ভাইপোর বাড়িতে গেল। বিয়ের প্রস্তাব করবার সময় ছেলের মা মেয়ের প্রেমের কাহিনীর কথা উল্লেখ করাতে ঘটকীঠাকরুণ তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ওসব গ্রাহ্য করতে নেই, বিয়ের পর একদিন মেয়েকে বেশ একটু উত্তম-মধ্যম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আই-আই'এর মা কিন্তু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছেন এবং সব ঠিক হ'য়ে যাবার ওষুধের ব্যবস্থার কথা শুনে স্থির করে ফেললেন ও বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। বাড়ীতে ফিরে স্বামীকে খবর দেওয়া মাত্র অশান্তি আরো বেড়ে উঠলো।

অপেরার গল্পটি বেশ জমে উঠেছে—সাংঘাতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে একটা হায় হায় ভাব। আই-

আই'এর মায়ের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের কথা জীবনে ভুলব না। ভাষার জন্যে কিছুমাত্র আটকায়নি—ওঁর প্রকাশভঙ্গী এত চমৎকার যে নাটকের বিষয়বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করতে খুব বেগ পেতে হয়নি। আগেকার দিনের চীনের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় মেয়েদের কি অবস্থা ছিল তার একটি পরিষ্কার ছবি এই অপেরায় ফুটে উঠেছে। কি নিদারুণ মর্মবেদনা বুকে চেপে সারা জীবন পুরুষদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হোত মেয়েদের, তার খবর কেউ রাখতো না, কারণ মেয়েরা তো মেয়ে—ওদের আবার এত কি? নতুন চীনে এই মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আই-আই'এর সমস্যা আর কোন সমস্যাই নয়। নতুন বিবাহ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে পুরানো দিনের অসার দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন প্রবীণদের খামখেয়ালী মনোভাবের উপর চীনের আই-আই'দের আর নির্ভর করে থাকতে হয় না। নতুন ব্যবস্থাপনায় জেলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার গ্রামে গ্রামে গিয়ে তদন্ত ক'রে বেড়াচ্ছেন—আই-আই এবং শিয়াও ওয়ান তাদের দুঃখের কাহিনী জেলা অফিসারকে জানালো, গাঁয়ের প্রধানের নির্দেশ বাতিল হ'য়ে গেল। নতুন দম্পতি পরমানন্দে নতুন জীবন আরম্ভ করে দিলো, গাঁয়ের সবাই খুশি—প্রেক্ষাগৃহের সবাই খুশি—আমরাও খুশি।

পিকিং শহরের লণ্ঠন উৎসবের অপেরাটি দেখে মনে হোল পিকিং অপেরার শিল্পীরা আজ নতুন ক'রে ভাবতে শুরু করেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের অত্যন্ত সাধারণ কাহিনীগুলি অবলম্বন করে সুন্দর নাটক রচনা এবং পরিবেশন ক'রে জনসাধারণের সামাজিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মানকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব ওখানকার শিল্পীরা কাঁধে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ওদেশের সব চাইতে জনপ্রিয় অভিনেতা মিঃ মি-লান্-ফ্যাং-এর কথার উল্লেখ করলে ওদেশে কি হচ্ছে কিছুটা বোঝা যাবে। মি-লান্-ফ্যাং চীনের একজন বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল অপেরা শিল্পী। গত পঞ্চাশ বছর ধরে মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বর্তমানে তাঁর বয়স ষাট বৎসর। দেখে বোঝা যাবে না তাঁর এত বেশী বয়েস হ'য়েছে—এখনও মেয়েদের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন এবং অভিনয় করার সময় যাঁরা ওকে জানেন না তাঁদের পক্ষে উনি ছেলে না মেয়ে ধরা অসম্ভব। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা লিখে ঠিক বোঝানো যাবে না। চিয়াং কাইশেকের কবল থেকে চীন মুক্ত হবার পর তিনি জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি বললেন যে চীনের দর্শক-সাধারণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী আগেকার দিনের মত যে নেই তা তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পুরানো একটি নাটকের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, ঐ নাটকে একটি যুদ্ধবাজ সামন্তের ভূমিকায় তাঁর করুণ রসের অভিনয় দেখে আগেকার দিনে দর্শক-সাধারণ চোখের জল সংবরণ করতে পারতেন না; আজ সেই ভূমিকায় তিনি যতই করুণ রস পরিবেশন করুন না কেন দর্শকরা যুদ্ধবাজ সামন্তের কোণঠাসা অবস্থা দেখে আনন্দে হেসে ওঠেন ও নানা রকম ব্যঙ্গ করতে থাকেন। আরেকটি পুরানো নাটকের একটি চরিত্রের উক্তিতে 'মেয়েলী প্যানপ্যানানী' (Woman's

Nonsense) কথা দু'টি রয়েছে। সেই নাটকটি বিপ্লব হয়ে যাবার পর একদিন অভিনীত হবার সময় অভিনেতার মুখ থেকে যেইমাত্র ঐ কথা দু'টি উচ্চারিত হোল তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ প্রতিবাদের আওয়াজে গম্‌গম্‌ করে উঠল। তার পরের দিন থেকে মি-লান্‌-ফ্যাং অসংখ্য চিঠি পেয়েছেন এবং প্রত্যেকটি চিঠিতেই ঐ কথা দু'টি নাটকটি থেকে তুলে দেবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। চীনের দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তবের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে না চলতে পারলে শিল্পীদের আর কোন উপায় নাই। মি-লান্‌-ফ্যাং নিজে এত বড় ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পী হয়েও চীনের নতুন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিক চারু শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বর্তমান কালের বাস্তব জগৎ থেকে রসদ সংগ্রহ করে চীনের ক্ল্যাসিক্যাল অপেরা ও নাটককে যে আরো সজীব ও সম্পদবান্‌ করে তোলা যায় তা তিনি প্রমাণ করেছেন।

তাঁর নেতৃত্বে এই বিষয়ে নানা ধরনের গবেষণার কাজ চালাবার জন্য চীনের নতুন সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য করে যাচ্ছেন। জাতিকে গড়ে তোলাব কাজে শিল্পীদের যে কতখানি দায়িত্ব তা চীন সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই মি-লান্‌-ফ্যাংকে চীনদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের [পলিটিক্যাল কন্সালটেটিভ কন্‌ফারেন্স] সভ্য ক'রে নিয়েছেন।

নাটক এবং অপেরার ব্যাপারে গবেষণার কাজ যেমন চলেছে, সঙ্গীতের বেলায়ও এই ধরনের গবেষণা চালাবার জন্যে অনেক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কি ধরনের গবেষণা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা কিম্বা তথ্যসংগ্রহ করার সুযোগ এবং অবকাশ হয়নি। কিন্তু ওদের কতকগুলি অনুষ্ঠানে চীনের তরুণ শিল্পীদের সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীত শুনে মনে হয়েছে যে, চীনের লোকসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সুরের কিছু সংমিশ্রণ

ঘটেছে। এবং এই সংমিশ্রণের ফলে গানগুলির মধ্যে অপূর্ব সজীবতা ফুটে উঠেছে। একশোটি ছেলেমেয়ে, চৌত্রিশটি বাদ্যযন্ত্র-শিল্পীর সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই সঙ্গীতগুলি যখন পরিবেশন করতেন, তখন কী যে অপূর্ব রসের সৃষ্টি হ'ত, তা বলে বোঝানো যাবে না। ওদের কোরাস গানগুলি শুনে আনন্দ ত পেয়েছিই আবার ভীষণ যন্ত্রণাও বোধ করেছি। যন্ত্রণা বোধ করেছি এই ভেবে যে আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে আমাদের দেশের এই ধরনের গানগুলি চীনের দর্শক-সাধারণকে শোনাতে পারলাম না। ওদের বড় বড় কোরাস দলের গান শুনলেই মনে হোত 'ইস! কলকাতার গণনাট্য সংঘের কয়েকটি গাইয়ে এবং সুচিত্রা মিত্র ও প্রীতি ব্যানার্জী আমাদের দলে থাকলে আমাদের গণনাট্য সংঘের কয়েকটি গান শুনিয়ে আমরাও ওদের চমক লাগিয়ে দিতে পারতাম।' 'হিন্দী-চীনি' গানটা শুধু দু'জনে (সুরিন্দর এবং আমি) গাইতাম এবং ঐ গান শুনেই কত ছেলেমেয়ে যে গানটা আমার কাছ থেকে শিখে নিয়েছে, তার ঠিক নেই। একদিন প্রোফেসার ভার্মা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বারোজন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার ঘরে হাজির। ওরা নাকি 'হিন্দী-চীনি' গানটি শিখবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। সারা-দুপুর বসে বসে গানটা শিখল। সেদিন রাত্রে পিকিং শহরে আমাদের শেষ অনুষ্ঠান ছিল; ওরা সবাই আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল। 'হিন্দী-চীনি' গানটা গাইবার সময় লক্ষ্য করলাম ওদের মুখগুলি আনন্দে উদ্ভাসিত, হাতছানি দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। পরে দর্শকদের আসনে বসে বসেই আমাদের গানের সঙ্গে গলা জুড়ে দিল।

পিকিং শহরে পৌঁছেছিলাম ২০শে জুলাই রাত্তিরে—২৯শে জুলাই পর্যন্ত গল্প যা বলার ছিল বলা হ'য়ে গেছে—৩০শে জুলাই-এর পর থেকে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলি অনেকটা আগেকার গল্পের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তবে কিছু কিছু তথ্য এখনও বাকী রয়ে গেছে যা না লিখলে আমার চীন ভ্রমণকাহিনী একটু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পিকিং-এ ন' দিন হয়ে গেল—যা জানতে চেয়েছিলাম তা' আর জানা হোল না—এখানে থাকার মেয়াদ আর মাত্র একদিন—৩০শে জুলাই, এবং সেদিনটিও গ্রাম পরিদর্শন করার জন্যে তোলা আছে। সকাল বেলায়ই গ্রামে বেরিয়ে প'ড়তে হবে—তাই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তৈরী হ'য়ে নিয়েছি। ঘরে ব'সে এক পেয়ালা কফি পান করতে করতে ভাবনা হোল, দেশে ফিরে গেলে গণনাট্য সংঘের বন্ধুরা চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে চাইলে কী বলবো? চীন সরকারের সঙ্গীত বিভাগের একজন নেতা ল্যু-চি'কে কবে বলে রেখেছি—অথচ এই ক'দিনের মধ্যে ওঁদের সময়ই হ'ল না। ভেবে নিলাম ওঁরা হয়তো আমাদেরই মত। কী আর করা যাবে?

হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ—বাইরে কোথাও বা'র হবার কথা থাকলে এক ঘণ্টা আগে থেকেই দোভাষীরা প্রস্তুত হবার জন্য তাগাদা দিতে থাকে—এ ব্যাপারটা একটা নিয়মের মত হ'য়ে গেছে; এবং এই ধরনের আওয়াজ হলেই আমি চেঁচিয়ে বলে দিই, 'আমি প্রস্তুত, নীচে নামবার সময় খবর দিও'। এই ক'দিনের অভ্যাসের ফলে সেদিনও দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জবাবটিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল; কিন্তু আবার ঐ আওয়াজ হওয়াতে বললাম, 'দয়া করে ভেতরে আসুন।' ভেতরে ঢুকলো উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে—তার নাম মুজু

চ্যুং ইউয়ান্, আমাদের দোভাষীর কাজ করে। দ্জু বললে, মুক্তি-ফৌজের তুইজন কর্মী নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। প্রশ্ন করলাম—'কেন?' দ্জু বললে—'সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে ওঁরা এসেছেন, কিন্তু আজ তো একটু পরেই গ্রাম দেখতে যেতে হবে আপনাদের—ওদেরকে অন্য সময়ে আসতে বলবো?' লাফ দিয়ে উঠে বললাম, 'পাগল! দেশে মেলা গ্রাম দেখেছি—আর তোমাদের দেশে ইচ্ছে করলে মেলা গ্রাম দেখা যাবে কিন্তু এ সুযোগ আমি আবার কোথায় পাব? শীগ্‌গির আমাদের দলপতির বসবার ঘরে ওদের নিয়ে বসাও, আমি কাগজ কলম নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি।' দ্জু চলে যাচ্ছিল—আবার ডেকে বললাম, 'আমার জন্য একটা মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করে রেখো—কারণ আমার অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিয়ে পরে গ্রাম দেখতে যাব।' তু' তিন মিনিটের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলে দ্জু ফিরে এসে দলপতির বসবার ঘরে আমায় নিয়ে গেল। আগন্তুক তু'জনের একজন মহিলা, তুজনেরই মিলিটারী সাজ পোশাক—মহিলাটির নাম মা-নান এবং ভদ্রলোকটির নাম লি-উই। যথারীতি আলাপ পরিচয় হ'য়ে যাবার পর আলোচনা সুরু হ'য়ে গেল। ওঁরা ইংরেজী ভাষা জানেন না—দ্জুর ওপর ভার পড়েছে দোভাষীর কাজ করবার। আমার কয়েকটি প্রশ্ন আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—সেই প্রশ্নগুলির জবাব ওঁরা দিতে আরম্ভ করলেন। আরো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে সেগুলি পরে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

কুয়োমিণ্টাং শাসনের আমলে চীন দেশের কী অবস্থা ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমে ওঁরা দিলেন। তখনকার শাসকগোষ্ঠী জানতো যে, দেশের জনসাধারণ যত অশিক্ষিত থাকবে অবাধ শোষণের কাজ ততই সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই কায়দা করে দেশের অর্থ-

নীতিটাকে এমন এক চরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যে অবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে শুধু বেঁচে থাকাটাই একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল। কাজে কাজেই অতি সাধারণ শিক্ষা লাভ থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত থাকতে হোত। তাছাড়া, বাক্-স্বাধীনতা, জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির কোন বালাই ছিল না। এর মধ্যেও কিছু কিছু ছাত্র দেশের সম্বন্ধে একটু আধটু ভাবতো, কিন্তু ভাবলে কি হবে—ধোলাই-মলাই, জেল, ফাঁসী ইত্যাদি নানা রকম কড়া ব্যবস্থা থাকার দরুণ কোন আন্দোলনই দানা বেঁধে উঠতে পারতো না। প্রচণ্ড দমননীতি থাকার ফলে গা-ঢাকা দিয়ে যতটুকু কাজ করা যায় ততটুকুই হোত অতি কষ্টে। তখনকার প্রগতি আন্দোলন শুধু জাপ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এ ধরনের আন্দোলনও কুয়ো-মিণ্টাং সরকার কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারতো না। দেশাত্মবোধক গানগুলি সব বে-আইনী ক'রে রাখা হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক কর্মীর দল গোপনে গোপনে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নানা ধরনের দেশাত্ম-বোধক গান গেয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। এই সব কর্মীরা জনসাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন বলেই বিপদকালে জনসাধারণের কাছে আশ্রয় পেতেন। লু শুন্ একজন বিপ্লবী সাহিত্যিক বলে পরিচিত ছিলেন (এঁর কথা আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে)। তাঁকে বন্দী ক'রে রাখবার জন্যে কুয়োমিণ্টাং সরকারের পুলিশ বহু চেষ্টা ক'রেও সফল হ'তে পারেনি—অথচ সাংহাই শহরের সাধারণ লোকের সাহায্যে লু শুন্ পুরো দশ বছর আত্মগোপন ক'রে সাংহাই শহরে এবং চীনের নানা অঞ্চলে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। লেফ্‌ট্ উইং রাইটার্স লীগ নামে একটি সংঘ চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সংঘের সভ্যদের অনেকেই কমিউনিস্ট ছিলেন না কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি গভীর আস্থা ছিল বলেই লু শুনের নেতৃত্বে

তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন দেশ সেবার কাজে। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির দরুণ সংঘের কাজ অত্যন্ত সতর্কভাবে গোপনে গোপনে চালানো হোত। তখনকার দিনের সাহিত্যিকরাই ছিলেন চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্ণধার—এই সাহিত্যিকরাই চীনের নানা অঞ্চলে এই ধরনের সংঘ তৈরী ক'রে দেশের যুবশক্তিকে বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট ক'রে তুলেছিলেন। এই সাহিত্যিকদের লেখাই চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী এবং শিল্পীদের প্রাণে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এই সংঘগুলির উদ্যোগে নানা ধরনের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক প্রকাশিত হোত এবং তরুণ বামপন্থী সাহিত্যিকদের এই সব পত্রিকায় লিখতে সুযোগ দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করা হোত। ফলে এই সব তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতিভার বিকাশ তো ঘটেছিলই, তাছাড়া এঁদের লেখার মারফৎ ছাত্র সমাজের মধ্যেও বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। চীন বিপ্লবে চীনের পুস্তক ব্যবসায়ীদেরও বেশ কিছু অবদান আছে। এই পুস্তক বিক্রেতারা গোপনে গোপনে প্রগতিবাদী পত্রিকাগুলি ছাত্র সমাজের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে আন্দোলনের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন।

এই লেফ্‌ট্‌ উইং রাইটার্স লীগ-এর মত সংঘগুলির সঙ্গে কিছু কিছু সঙ্গীত শিল্পীও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিপ্লবী সাহিত্যিকদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে এই সব শিল্পীরা কুয়োমিণ্টাং সরকারের পুলিশের নজর এড়িয়ে নানা ধরনের দেশাত্মবোধক গান জনসাধারণকে মুখে মুখে শিখিয়ে আসতেন। থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চগুলি এই সব সাংস্কৃতিক কর্মীদের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল বলে রাস্তায় ঘাটে ছোট ছোট প্রগতিমূলক নাটক পরিবেশন করবার ব্যবস্থা ছিল। পুরানো নাটকের মধ্যে নতুন ভাবধারা ঢুকিয়ে নিয়ে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করবার রেওয়াজও ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে আস্থাশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে ছোট ছোট ফিল্ম তৈরী করে গোপনে সেগুলি দেখানো হোত। বলা বাহুল্য যে, এই সব সংঘ চীনের

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই পরিচালিত হোত। কিন্তু আন্দোলনের কাজে শ্রমিকশ্রেণী থেকে বুদ্ধিজীবী কর্মী খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যেতো না—সমস্ত দেশময় নিরক্ষরতাই তার কারণ।

চীনের মুক্তিফৌজের দুইটি কর্মীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা চলেছিল প্রায় সাড়ে-চার ঘণ্টা—এই সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে যা জানতে পেরেছিলাম তা' এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ওদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যাপারটা একটা লম্বা একটানা দুর্ধর্ষ লড়াই। এই লড়াই-এর পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন ওদেশের বামপন্থী সাহিত্যিকের দল এবং সেই পরিচালনা ঘরে ব'সে নয়—রীতিমত লড়াই-এর ময়দানে নেমে। জীবন বিপন্ন ক'রে, অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে অক্লান্তভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে কি ক'রে দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যায় এই ছিল ওদের একমাত্র চিন্তা। কুয়ো-মো-জো এখন চীনের শান্তি কমিটির একজন প্রধান নেতা, কিন্তু এককালে কী যে অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে সেই বিষয়ে একটি ছোট গল্প লি-উই-এর মুখে শুনলাম। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিণ্টাং দলের মধ্যে একটা আপস মিটমাট হ'য়েছিল। এই মিতালী উপলক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় কুয়ো-মো-জো বক্তৃতা দিচ্ছেন—হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কুয়োমিণ্টাং-এর একদল গুপ্তচর সভায় ঢুকে কুয়ো-মো-জোকে ধরে বেদম মার। বেচারীর প্রায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। এই তো মিতালীর নমুনা! মিতালী ভেঙ্গে যাওয়ার পর সংগ্রাম আরও কঠিন হ'য়ে উঠলো। সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রাণ হাতে করে নিয়ে কাজ করতে হোত। প্রগতিশীল চিন্তার গন্ধ চিয়াং কাইশেকের মোটেই সহ্য হোত না। মা-নান ও লি-উই উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, চিয়াং-কাইশেকের অমানুষিক নির্যাতন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চ্যাংশী এলাকা মুক্ত হবার পর থেকে

আন্দোলনের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে চীনে কিছুটা সামন্তবাদ ও কিছুটা সাম্রাজ্যবাদ শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। দেশের অবস্থা বুঝে বামপন্থী নেতারা একটি মুক্তিফৌজ গড়ে তুলবার দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই চেষ্টা সফল হ'য়ে উঠেছিল বলেই চিয়াং-এর কবল থেকে তাঁরা কিছুটা এলাকা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন। এই খবরটা চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু কর্মী গোপনে মুক্ত এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়েন। দক্ষিণ দিকের অঞ্চলগুলি থেকে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে পায়ে হেঁটে কর্মীরা উত্তরের দিকে ছুটে এলেন। পথে কিছু কিছু কর্মী ধরা পড়ে গেলেন—আবার কিছু লোক কড়া পাহারার দরুণ অগ্রসর হ'তে সমর্থ হননি। চিয়াং-এর বেড়াজাল অতিক্রম করে যে ভাগ্যবানদের দল মুক্ত এলাকায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন তাঁদের কাছে খবর পেয়ে যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদের আসতে সাহায্য করার জন্যে আবার লোক পাঠানো হোত। চিয়াং-এর এলাকায় কমিউনিস্টদের অনেকগুলি গোপন ঘাঁটি ছিল বলে এই ভাবে উদ্ধার করার কাজ খুব সুবিধে হ'য়েছিল। নতুন ভাবধারায় আকৃষ্ট হ'য়ে দিন দিন দলে দলে লোক মুক্ত এলাকায় চলে আসার ফলে মাও সেতুং দলে ভারী হ'য়ে উঠতে লাগলেন। লি-উই নিজে কুয়োমিণ্টাং দলের একজন যোদ্ধা হ'য়ে ভর্তি হয়েছিলেন—কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর সুযোগ বুঝে হঠাৎ সটকে পড়ে কুয়োমিণ্টাং-এর বিরুদ্ধে বন্দুক ধরলেন। এই ধরনের ঘটনা কত যে ঘটেছে তার কোন হিসেব নেই। এই হিড়িকে বহু সাংস্কৃতিক কর্মীও মুক্ত এলাকায় ভিড়ে গেলেন। সঙ্গীতশিল্পী হো-ল্যু-ডিন্ (তৎকালীন চীন সেনট্রাল্ মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ) মুখে দাড়িগোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশে চ্যাংশী এলাকায় যেতে সমর্থ হ'য়েছিলেন।

মুক্ত এলাকায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ-কর্ম একটি নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী চালাবার চেষ্টা শুরু হোল। ইয়েনান-এ চৌ-

ইয়াং-এর নেতৃত্বে 'লু শুন্ আর্ট এ্যাণ্ড লিটারেরী ইনস্টিটিউট' নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। শিক্ষার্থীদের মাইনে তো দিতেই হোত না— খাওয়া-পরা এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচের জন্যেও তাদের কোন ভাবনা ছিল না। সঙ্গীত-শিল্পী, অভিনয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে উঠতে লাগলো এবং শিল্পীর দল সংগঠিত-ভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের ভেতরে আন্দোলন-এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিছু কিছু শিল্পী ফৌজের কাজে লেগে গেলেন—সেখানে ছোট ছোট দল গড়ে তুলে সৈন্যদের গান ও নাচ শেখানো ছিল তাঁদের কাজ। এই সাংস্কৃতিক কর্মীর দল মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন, লড়াই-এর সময় তাদের সঙ্গে 'ট্রেঞ্চে' চলে যেতেন এবং দরকার পড়লে বন্দুক ধরতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হোতেন না। লড়াই-এর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অবলম্বন ক'রে নাটক, গান ও নাচ বীর-যোদ্ধাদের সামনে পরিবেশন করে তাঁদের মনোবল বাড়িয়ে তোলবার সাহায্য করা হয়েছিল বলেই মুক্তি-ফৌজের বীর যোদ্ধারা দৃঢ় পদক্ষেপে জয়ের পথে এগিয়ে যেতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। এক-একটি খণ্ডযুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবার পর যখন বীরত্বের কার্যকলাপের একটি হিসেব-নিকেশ করা হোত তখন সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদানও সেই হিসেবের মধ্যে ধরা হোতো। তাঁদের এই বিশেষ অবদানের জন্যে আজ তাঁরা চীনের জনসাধারণের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছেন—দেশবাসীর কাছে আজ তাঁরা বীর যোদ্ধা ব'লে পরিচিত এবং সম্মানিত।

তত্ত্বগত সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রীমতী মা-নান্-এর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর মতে এই আন্দোলনের কাজটাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সব চাইতে দুরূহ কাজ। দীর্ঘকাল-ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য এবং কঠোর অধ্যবসায় ব্যতীত আর কোন

সোজা পথ এই কাজে নেই। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ইয়েনানে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মাও সেতুং-এর নির্দেশ পেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা চারুশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ভাব-ধারা চালু করবার কাজ আরম্ভ করেন। সাধারণ মানুষের জীবন যে শিল্প-সৃষ্টির এক বিরাট ক্ষেত্র হ'তে পারে সে সম্বন্ধে তখনকার চীনের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কোন ধারণাই ছিল না। কাজে কাজেই জীবনধর্মী শিল্প-সৃষ্টির আসল রূপটা কী ধরনের হওয়া উচিত তা' খুব তাড়াতাড়ি একটা ধারণা করে নেওয়া নেহাৎ সোজা ছিল না। মুক্ত এলাকায় নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই কাজে কিছুটা আলো পাওয়া গিয়েছিল— সেখানকার অভিজ্ঞতার ছোঁয়াচ আস্তে আস্তে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীরা বেশ ভালো করে বুঝেছিলেন যে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে জীবনধর্মী শিল্প-সৃষ্টি অসম্ভব এবং মানুষের জীবনই শিল্প-সৃষ্টির একমাত্র অফুরন্ত উৎস। এই নতুন ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আন্দোলনের কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের কাজের মূল নীতিটি অল্প কথায় ছিল—

১। চীনের শিল্পকর্মের প্রকৃতি হবে চীনের মুক্তি যুদ্ধের মতো ;

২। চীনের জনসমষ্টির মত চীনের সৃষ্টিও হবে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ;

৩। চীনের শিল্প ও সংস্কৃতিকে হতে হবে পুরোপুরি জাতীয় ভাবধারার বাহক, বিজ্ঞানসম্মত এবং তা' হবে জনসাধারণের সম্পদ ; শিল্পকে নিশ্চয়ই শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, প্রত্যেকের কাজে লাগাতে হবে।

কাও-ইউ-পাও ছিল অত্যন্ত দরিদ্র চাষী—পরের জমি চাষ করে কোনমতে পেট চালাতো—কোনদিন খেতে পেতো কোনদিন হয়তো উপোস ক'রেই দিন কাটাতে হ'ত। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়া করার ভারী সখ তার—একটু বড় হ'য়ে ইস্কুলেও ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পয়সার অভাবে একমাসের বেশী পড়াশোনা হ'ল না। সৌভাগ্যক্রমে চীনে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল—এই সুযোগে কাও মুক্তি ফৌজে নাম লেখালো। ফৌজে ঢুকে তার প্রথম কাজ হোল মুক্তি-ফৌজের অফিসের সদর দরজায় বসে থাকা এবং বাইরে থেকে যেসব চিঠিপত্র আসতো সেগুলি অফিসের ভেতরে জায়গা মতো পৌঁছে দেওয়া। এই কাজ করতে করতে সে কিছু কিছু পড়তে শিখে ফেলল। ফৌজের দু'একজন কর্মীর সাহায্যে চীনের জমিদার ও সামন্তদের সম্বন্ধে দু-একটা বই প'ড়ে তার মনে হোল তার নিজেরও এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। এই জমিদারদের হাতে কী যে নির্যাতন তাকে ভোগ করতে হয়েছে সেইসব কাহিনী জানাবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা অন্যান্য দেশের মতো এতো সোজা নয়। কাও শুধু পড়তে জানে, লিখতে নয়। মুক্তি ফৌজের বন্ধুদের সাহায্যে সে লিখতে শেখার কাজ শুরু করে দিল। খানিকটা চীনে অক্ষর, খানিকটা ছবি দিয়ে তার মনের ভাব সে প্রকাশ করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে লেখার নেশা তাকে এতো বেশি পেয়ে বসেছিল যে, মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করতে করতে যখন দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছিল কাও মুক্তিফৌজের

অগ্রদূতের মত আগের থেকেই অনেকটা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসে তার লেখার কাজ করতে থাকতো এবং দলের অন্যান্য সবাই তার কাছে পৌঁছে গেলে আবার সে আগেই কিছুটা পথ এগিয়ে থাকতো। এইভাবে কিছুটা ছবি, কিছুটা অক্ষর সাজিয়ে লেখার ব্যাপারে এতো বেশী কাগজ খরচ হোত যে, শেষ পর্যন্ত তার কাগজপত্র ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হ'য়েছিল। মা-নান্ এর মুখে গল্পটি শুনতে শুনতে দৃশ্যটি কল্পনা করে নিলাম—কাও লিখছে আর তার লেখা ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছেন!

কাওএর লেখাগুলি অবশ্যি পরে ভাল লেখকের সাহায্যে বই-এর আকারে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় দুই লক্ষ শব্দ সম্বলিত একটা আত্মজীবনী প্রকাশিত হবার পর কাওকে নতুন করে লেখাপড়া শেখবার জন্যে আবার ইস্কুলে ভর্তি করানো হোল।

শুধু কাওই নয়, মুক্তিফৌজের আওতায় এসে চীনের বহু চাষী ও শ্রমিক লেখাপড়া শিখে ভাল লেখক হ'য়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছেন। আরও নতুন নতুন লেখক ও সাহিত্যিক তৈরী করবার জন্যে প্রতিভা-সম্পন্ন চাষী ও শ্রমিকদের উৎসাহদান ক'রে এবং নানা ধরনের সাহায্য ক'রে চীনের নতুন গভর্ণমেন্ট যে নতুন পথ দেখিয়েছেন, তা সাবেককালের চীনে ছিল কল্পনাতীত।

মা-নান্ ও লি-উই-এর সঙ্গে আলোচনার আগে ও পরে চীনের শিল্পীদের কার্যকলাপ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি। নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে ওঁরা অনেকেই নতুন শিল্প সৃষ্টির কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তা ব'লে দেশের সমস্ত শিল্পীই যে তত্ত্বগতভাবে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন তা' জোর করে বলতে পারিনে।

কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের সংস্কারের কাজে সম্পূর্ণ-ভাবে সফল হ'য়ে ওঠা অসম্ভব। 'বৌদ্ধ মুদ্রা' নামক অপেরাটি দেখে মনে হ'য়েছিল ওদেশের শিল্পীরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন। ওঁদের

সঙ্গীত শিল্পীদের কিছু কিছু গান শুনে মনে হ'য়েছে যে, জনসাধারণের প্রাণে তাঁরা নতুন আশা জাগাতে পেরেছেন। উত্তর দিকের অঞ্চলগুলিতে অর্থাৎ পিকিং তিয়েন্‌সিন্‌ ও সাংহাই প্রভৃতি শহরগুলিতে এই শিল্প-সৃষ্টির কাজে তত্ত্বগতভাবে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, দক্ষিণ দিকের অঞ্চলগুলিতে ততটা হয়নি ব'লে মনে হোল। হ্যাংচাও শহরে একটি অপেরা দেখেছিলাম—অপেরাটি বোধ হয় চীন বিপ্লবের আগেই লেখা, কারণ অপেরার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটু পুরানো গন্ধ পাওয়া গেল। অপেরাটির নায়িকার বিয়ে অন্য পাত্রের সঙ্গে ঠিক হচ্ছে শুনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে মারা গেলেন নায়ক। নায়িকার বিয়ের মিছিল নায়কের কবরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল নায়িকা ভগবানের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন, হঠাৎ বজ্রপাত এবং সঙ্গে সঙ্গে কবরটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। নায়িকাও তৎক্ষণাৎ সেই কবরের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। একটু পরেই দেখা গেল নায়ক ও নায়িকা ডানা লাগিয়ে দুটি প্রজাপতি হ'য়ে নাচতে নাচতে স্বর্গে যাত্রা করছেন। অপেরাটি দেখতে দেখতে বারে বারে মনে হচ্ছিল—'তত্ত্বগত সংস্কার আন্দোলন-এর কাজটা সংস্কৃতি আন্দোলনের সব চাইতে দুরূহ কাজ'। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীরাও এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। এ সব তত্ত্ব তাঁদের কাছে নতুন নয় এবং এই সব তত্ত্বানুযায়ী শিল্প-সৃষ্টির কাজ কী ধরনের হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা তাঁদের আছে। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তত্ত্বজ্ঞান যতই থাকুক না কেন জীবনধর্মী শিল্পসৃষ্টি সহজে হ'য়ে ওঠে না। কেন হয়ে ওঠে না তার নানা ধরনের কারণ অবশ্যি বা'র করা হ'য়েছে এবং আরো করা হবে। এ বিষয়ে আমাদের শিল্পীরাও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে নেই, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন

শিল্পসৃষ্টির কাজ একটা পুরোপুরি রূপ না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরানো জিনিসের প্রতি একটু বেশী ঝোঁক থাকবেই। চীনে রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে ওখানকার জনসমষ্টির সামাজিক চেতনা অনেক বেড়ে গিয়েছে; ফলে সামাজিক-চেতনা-সম্পন্ন দর্শক-সাধারণের চাহিদা মেটাবার তাগিদেও দেশের শিল্পীদের এগিয়ে যাবার পথ দিন দিনই প্রশস্ত হ'য়ে যাচ্ছে। এটা কম সুবিধে নয়। সাংহাই শহরে ওদের এক অনুষ্ঠানে ওদেশের দু'জন হরবোলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তাঁরা হাস্য-কৌতুক শিল্পী এবং প্রধানতঃ মুখ দিয়ে নানা ধরনের পশু পাখীর ডাক অনুকরণ করেন। সেই অনুষ্ঠানে প্রথমে ওঁরা বিড়াল কুকুর ও ছোট ছোট পাখীর ডাক শোনালেন—তারপর আধা-ঘুমন্ত একটি লোকের নাকের ডগার উপর দিয়ে উড্ডীয়মান একটি মশার আওয়াজ—হঠাৎ আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ—শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান আসছে—সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিফৌজের বিমান ওপরে উঠে গেল এবং ভীষণ লড়াই শুরু হ'য়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের বিমানটাকে ধ্বংস করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হ'ল।

এই অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পর দর্শকদের উল্লাস লক্ষ্য করবার মত। শুধু শেয়াল কুকুরের ডাক শুনিয়ে আজকাল চীনে দর্শক-সাধারণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করা হয়তো ঐ শিল্পীদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে নাচে বা গানে জীবনধর্মী শিল্পের সামান্য গন্ধও ছিল সেগুলি ওদেশের দর্শকদের প্রাণে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে, তার প্রমাণও আমি পেয়েছি। তিয়েনসিন থেকে ন্যানকিংএ যাবার পথে ট্রেনে মাদ্রাজের নৃত্যশিল্পী গোপালকৃষ্ণ হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর নাচ আমার কি রকম লেগেছে এবং চীনের দর্শকদের কাছে কি রকম লাগছে। আমি বললাম, 'ভারতবর্ষের মাটিতে তোমার নাচ অপূর্ব কিন্তু এখানকার লোকেরা আজকাল অন্য ধরনের ভাবনা চিন্তা ক'রছে। তুমি ময়ূরের পেখম লাগিয়ে

স্টেজময় নেচে বেড়াচ্ছো। ব্যাধের পোশাক প'রে, স্টেজের ওপরে ঘুঘু আর বাঘ শিকার করে ঘরে ফিরছো—হাততালি দিতে হয় তাই হাততালি ওরা দিচ্ছে—কিন্তু সত্যিই কি ওদের মনে কোন নাড়া দিতে পেরেছ? ওদের অপেরায় ওদের গানে যখনই সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা থাকে তখনই দর্শক-সাধারণ কি অসাধারণভাবে সাড়া দেয় তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। আমাদের দিলীপের আসামের রেল শ্রমিকের গান, ঝক্ ঝক্ রেল চলে মোর রেল চলে ওদের কী ভীষণ ভালো লেগেছে তুমি তো জান। আমার মনে হয় তোমারও ওরকম কিছু করা উচিত।' আমার কথা শুনে গোপাল-কৃষ্ণ বললে সেও নাকি এই ব্যাপারে একটু ভেবেছে। তার নিজের রচিত একটি নাচ 'যুদ্ধ ও শান্তি' দেখানো যেতে পারে কিন্তু আরো কয়েকজন নৃত্যশিল্পী না হ'লে তা দেখানো যাবে না। এ বিষয়ে নাকি আমাদের দলের সেক্রেটারীকে বলেও সে লোক যোগাড় করতে পারেনি।

ওর মুখে গল্পটা শুনে নিলাম—একটি ঘুঘু (শান্তি) নাচছে—হঠাৎ একটি বাজপাখীর (যুদ্ধ) আবির্ভাব—ঘুঘুটাকে শিকার করে শান্তিভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বাজপাখীর তাণ্ডব নৃত্য—তারপর চারদিক থেকে জনসাধারণ শান্তি পতাকা হাতে করে বাজপাখীকে তাড়া করবে। গল্প শুনে বললাম, 'বিষয়বস্তু খুবই মামুলী কিন্তু তোমার ময়ূর ও ব্যাধ নৃত্য থেকে ঢের ভালো।' আরো চারজন পুরুষ এবং একটি মহিলা নৃত্যশিল্পী হ'লেই এই নাচটি দেখানো চলে। ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী চন্দ্রলেখা ও কথাকলি নাচের দলের সর্দার নামবিষণকে ডেকে পাঠালাম। তাঁরা আমার কাছে সব শুনে গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সত্যিই রাজী হ'য়ে গেলেন। পরের দিন সকাল বেলা থেকে ন্যানকিং-এর হোটেলে আমার ঘরে রিহার্সাল আরম্ভ হ'য়ে গেল। তবলা, ঢোল

এবং মৃদঙ্গ বাজাবার জন্য ইন্দোরকার, দাসাপ্পা ও মূর্তির সাহায্য পাওয়া গেল। আবহসঙ্গীতের ভার আমায় নিতে হোল।

ল্যু ওয়ান্ জু-কে ডেকে বাজপাখীর জন্যে দুটো বিরাট ডানা আর মুখোস এবং ঘুঘুর জন্য একটি ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ীর ব্যবস্থা করতে বললাম। ন্যান্কিং-এর অনুষ্ঠানে এই নাচটি দেওয়া হলো—নাচের শেষের দিকে মঞ্চের চার কোণ থেকে সাদা ঘুঘু লাগানো ফিকে নীল রং-এর শান্তি পতাকা হাতে চারটি শান্তি সৈনিক নাচতে নাচতে ভেতরে ঢুকলেন এবং বাজপাখী ভয়ে ভয়ে পেছু হটতে লাগলো। নাচ শেষ হবার অনেক আগে থেকেই বিপুল হাততালি ও 'চাইলাই ইগো' এবং 'এন্কোর' প্রভৃতি আওয়াজে প্রেক্ষাগৃহটি যেন ফেটে পড়ে আর কী! শান্তিকামী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে যুদ্ধবাজের শোচনীয় পরাজয়ই চীনের জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট, তারপরে কী হোল জানবার কোনও দরকারই যেন নেই।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। পিকিং শহরে বেশ কয়েকদিন কাটাবার পর আমাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত ছিল তাঁদের কয়েকজনকে চীনদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চি-পাই-শী'র সঙ্গে আমায় দেখা করিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তাঁরা এই অনুরোধের কথা শুনে তো রীতিমত অবাক। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় আমায় প্রশ্ন করলেন—'আপনি তো সঙ্গীতশিল্পী—হঠাৎ চিত্রশিল্পীকে দেখতে আপনি এত আগ্রহী হ'লেন কেন?' তখন আমায় বলতে হ'ল, 'আমি শুনেছি আমাদের দেশের মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যাঁর গান আমি গাই) এই

চিত্রশিল্পীর দারুণ প্রশংসা করতেন। সুতরাং চীনে এসে সেই মহান শিল্পীকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ আমি ছাড়তে চাই না।' তখন তাঁরা আমায় জানালেন যে চি-পাই-শী শহর থেকে বেশ দূরে একটি গ্রামে আছেন—তবে তাঁকে শহরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করা হবে, এই আশ্বাসও দিলেন। পরে একদিন হঠাৎ একজন দোভাষী এসে খবর দিলেন যে চিত্রশিল্পী চি-পাই-শীকে শহরে এনে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ীতে রাখা হয়েছে। মোটর গাড়ী প্রস্তুত ছিল—দোভাষীর সঙ্গে তক্ষুনি রওনা হলাম। আমাদের দলের নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী চন্দ্রলেখাও চি-পাই-শীকে দেখবার বাসনায় গাড়ীতে উঠে পড়লেন।

তিরানব্বই বৎসর বয়স্ক চি-পাই-শী যেই শুনলেন আমি 'টেগোরে'র দেশ থেকে এসেছি এবং 'টেগোর'এর গান গাই—কী যে খুশী হ'য়ে উঠলেন তা লিখে বোঝানো যাবে না। দোভাষীর সাহায্যে নানারকম কথাবার্তা হ'ল। **'Socialist realism in art'** এই কথা কয়টি খুব প্রচলিত হয়েছে—ভারতেও শুনেছি—চীনদেশে এসেও শুনছি—যেখানেই যাই দেখি ট্রাক্‌টারের ছবি, কিংবা নানাধরনের যন্ত্রপাতির ছবি। কোথাও বা দেখতে পাই শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে নানাধরনের ছবি। এই কথাগুলি ব'লে চি-পাই-শীকে প্রশ্ন করলাম—'চীন দেশের চারুশিল্পের যে বিরাট ঐতিহ্যের কথা এতোকাল শুনেছি, বিপ্লবের পর সেই ঐতিহ্যকে কি একেবারে মুছে ফেলা হচ্ছে? চীনের শিল্পীরা কি যন্ত্রপাতির এবং যুদ্ধবিগ্রহের ছবি এঁকে খুশী মনে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন?'

আমার প্রশ্ন শুনে উনি একটু হেসে উঠলেন। তারপর আমায় বোঝালেন যে উৎপাদনের ব্যাপারে নতুন নতুন পদ্ধতির উপকারিতা চীনের সাধারণ চাষী ও শ্রমিকদেরকে বিশেষভাবে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই ঐসব নতুন নতুন ছবি আঁকানো হচ্ছে—ঐসব ছবির সাহায্যে দেশ-

কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের নানা ধরনের শিক্ষা দিতে পারছেন। এতে শিল্পীদের স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি তো এখনও প্রকৃতির কাছ থেকেই বিষয়বস্তু আহরণ করে ছবি আঁকি।' এই বলে তিনি তাঁর শিষ্যকে আঁকবার রঙ প্রস্তুত করতে বললেন। শিষ্যটিও একটি শক্ত পাথরের মতো কালো রঙের টুকরোকে জল দিয়ে একটি প্লেটে ঘ'সে ঘ'সে রঙ তৈরী করে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁশের কঞ্চির তুলি দিয়ে একটি বিরাট চিংড়ি মাছের ছবি এঁকে চি-পাই-শী আমায় উপহার দিলেন। সেই ছবির কথা লিখে বোঝানো যাবে না—এক কথায় 'অপূর্ব'।

যাঁর কথা এতো শুনেছি তাঁকে নিজের চোখে দেখে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিলো। চি-পাই-শী'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম—আর ভাবছিলাম 'Socialist realism in art'। চন্দ্রলেখা ছবিটির খুব প্রশংসা করছিল দেখে চিংড়ি মাছটি ওকেই উপহার দিয়ে দিলাম।

চীনের মুক্তিফৌজের কর্মী দু'টির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনা সাঙ্গ হ'ল প্রায় দুপুর সাড়ে-বারোটায়। মা-নান্ মাত্র ষোল বৎসর বয়সে মুক্তিফৌজে যোগদান করেছিলেন—পুরুষ যোদ্ধাদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে গেরিলা যুদ্ধের কাজে হাত পাকিয়েছিলেন। যুদ্ধে হঠাৎ শত্রুপক্ষের বুলেটে আহত হয়ে শত্রুশিবিরে দুই বৎসর বন্দী হ'য়ে থাকতে হ'য়েছিল—হাতে সেই বুলেটের আঘাত-

জনিত ক্ষতের দাগ এখনও রয়েছে। অস্ত্রোপচারের জন্য হাতখানি একটু ছোট হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু তার জন্য তাঁর কোন দুঃখ নেই।

বিপ্লবী যোদ্ধাদের বীরত্বের গল্পগুলি একটার পর একটা অক্লান্ত ভাবে বলতে বলতে মাঝে মাঝে ওঁর মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিলো। ওঁর বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল উনি যেন আমায় ওদেশেরই একজন বলে ধরে নিয়েছেন। আমি পড়ে গেলাম একটা দোটানা অবস্থায়—এঁদের ছেড়ে চলে যেতে মনটা সরছিলো না, আবার চীনের গ্রামের চাষীদের সঙ্গে দেখা করবার লোভও যথেষ্ট। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'পক্ষই উঠে পড়লাম। আমার জন্য একটা গাড়ী অপেক্ষা করছিলো—ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করলাম।

পিকিং শহর থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ—গ্রামটির নাম মনে নেই—পীচ বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কাঁচা রাস্তা বেয়ে প্রায় বেলা দুটোয় গ্রামে পৌছে দেখি আমাদের দলের সবাই খেতে বসে গেছেন। গাঁয়ের মাতব্বরেরাও খাবার টেবিলে রয়েছেন। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা পরিবেশনের ভার নিয়েছেন—বিশুদ্ধ চীনে খাবার—মাংসের কোপ্তা জাতীয় একটি পদ ছিল, সেটিই বেছে নিলাম। হঠাৎ শচীনদা আমায় একটা গান করবার ফরমাশ্ করলেন। আমি তো 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই' গাইতে সুযোগ পেলেই গেয়ে দিই—মিঃ টং (দোভাষী) ছিলেন আমাদের দলে—গানের মানেটা চীনে ভাষায় বলে দিলেন। আমার গানের পর ওদের ছেলেমেয়েরাও কিছু গান শোনালো।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি গ্রামের ত্রিশ-চল্লিশটি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে বিদেশী অতিথিদের দেখবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে—আমাদের দেখতে পেয়েই কচি কচি হাতে হাততালি। ওদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা ঠিক করে

ফেললো আমাদের একটু নাচ দেখানো হবে। গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে গান চললো। গানের কথা নেই—শুধু ইংরেজী 'সারেগামা' দিয়ে গান বাঁধা। কয়েকটি বাচ্চা প্রথমে একটু সংকোচ বোধ করছিলো বলে নাচতে রাজী হয়নি—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই এক এক ক'রে নাচের দলে ঢুকে পড়লো। নাচটা আমাদের দেশের ব্রতচারী নাচের মত। চাষীদের ছেলেমেয়েদের আনন্দময় জীবনের একটুখানি নমুনা দেখে রওনা হলাম ওদের বাড়ী-ঘর দেখতে। আমি পৌঁছবার আগেই গ্রামের হাসপাতাল, ইস্কুল, কো-অপারেটিভ দোকান ইত্যাদি সব দেখানো হয়ে গিয়েছিল। মাঠের ধার দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক বাড়ীতে পৌঁছানো গেল। বাড়ীটায় নতুন ইঁটের দেওয়াল—ছাদটা টালির। বাড়ীর মালিক একজন প্রৌঢ় চাষী চীনের চা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন তাঁর আত্মজীবনী।

চিয়াং কাইশেকের আমলে চাষীদের অবস্থা ছিল পশুর চেয়েও অধম। কতদিন যে না খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। বাচ্চাদের জন্য একটা জামা কিনে দেবার সঙ্গতিও ছিল না। আজ নতুন চীনে ভাত-কাপড়ের দুঃখ জন্মের মত ঘুচে গেছে। বছরে দু'বার বাচ্চাদের জন্য নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতে পারেন বলে তাঁর কী আহ্লাদ! তাঁদের অবস্থার এই পরিবর্তনের জন্য মাও সেতুংই যে দায়ী সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই চেয়ারম্যান মাও-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর কথা বলতে বলতে গর্বে ওঁর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিলো। হঠাৎ বাজনার আওয়াজ পেলাম—লক্ষ্য করে দেখি দেয়ালের গায়ে কাঠের তাক-এর ওপর একটি ছোট রেডিও বসানো; কথা বলতে বলতে কখন যে চালিয়ে দিয়েছেন টের পাইনি—রেডিও কিনবার সামর্থ্য হ'য়েছে তা মুখে না ব'লে রেডিওটা চালিয়ে দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছুর জন্য

মাও-এর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ওঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে আরেকটি চাষীর বাড়ীতে যাওয়া হোল। সে এখনও প্রৌঢ় হ'য়ে ওঠেনি—তার মুখেও মাও-এর প্রশংসা। আমাদের সঙ্গে ক্যামেরা হাতে একজন প্রেস ফটোগ্রাফার ছিলেন। চাষী-যুবকটিকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আমাদের একটা ছবি তোলবার ব্যবস্থা হোল। আমরা সব তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ চাষীটি ফটোগ্রাফারকে হাত তুলে একটু অপেক্ষা করতে বলে নিজের কোটের বোতামগুলি খুলে ফেলে বুকটান করে মাথাটা পেছন দিকে একটু হেলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে 'পোজ' করে দাঁড়ালো। সে এক দৃশ্য! মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণে এর অর্থ কি দাঁড়াবে জানিনা, কিন্তু আমার মনে হোল সে যেন বলতে চাইছে—'তোমরা দেখ! চীনের চাষী আগে ছিল কীট পতঙ্গের মত, আজ তারা মাথা উচু করে বুকটান করে হাঁটে; বহুদিনের দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে আজ তারা মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছে'! তার এই 'কুছপরোয়া নেই' ভাবটি দেখে দেশের একটি ছবি মনে জেগে উঠলো। বাংলাদেশের চাষীদের পাঁজর বা'র করা নুয়ে পড়া চেহারাগুলি ভেসে ওঠে—কবে যে তারাও এমনি বুকটান ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে কে জানে!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কবি ভাল্লাথোলের একটু ঘুমিয়ে নেবার অভ্যেস—তাই একটু দেরী করে শহরে ফেরা হবে স্থির হল। একটি গানের বই কেনবার কথা ছিল ব'লে আমি আর অপেক্ষা না ক'রে তক্ষুনি রওনা হলাম। শহরে ফিরে এসেই বই-এর দোকান সব তছনছ করে দেখলাম—যে গানের বইটি চাই সেটি আর পেলাম না। পিকিং শান্তি কমিটি অবশ্য বইখানি আমায় পরে যোগাড় করে দিলেন।

পরের দিন চীনের ঐতিহাসিক প্রাচীর ও কোয়ানটুং জলকুম্ভ দেখতে গেলেন অনেকেই। অসুস্থতার জন্যে আমার যাওয়া হ'ল না ব'লে আফ্‌শোষ হ'ল।

পয়লা অগাস্ট বেলা একটায় পিকিং থেকে বিদায় নিয়ে প্রায় সোয়া তু'ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেনে তিয়েন্‌সিন্‌ শহরে পৌঁছে গেলাম।

তিয়েন্‌সিন্‌ শহরটি একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র। নানা ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শহর ভর্তি। বস্ত্রশিল্পই বোধহয় বেশি। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের আওতায় বিদেশী পুঁজিবাদীর দল শহরটিকে বিদেশী ছাঁচে গড়ে তুলেছিল। যদিও ইউরোপে কখনও যাইনি, ছবি ও সিনেমার কল্যাণে ওদেশের শহরগুলি সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে। তিয়েন্‌-সিনে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটগুলি অনেকটা ইউরোপীয় শহরের মতই দেখতে। বিদেশী ধন-কুবেরদের লীলাক্ষেত্র ছিল বলে এখানকার হোটেলগুলিও তাদের বাসোপযোগী ক'রে তৈরী। যে হোটেলটি আমাদের জন্য ঠিক করা হ'য়েছিল সেটা প্রায় কলকাতার 'গ্র্যাণ্ড' অথবা বোম্বাই-এর 'তাজমহল' হোটলের মতই। হোটেলের সামনের দিকে একটি বিরাট পার্ক—পার্কের ভেতরে ফুল গাছের সারি—ছোট ছোট রাস্তা, মাঝখানে চারিদিক খোলা একটি সুন্দর ঘর। হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম করবার জন্য অনেক বসবার জায়গাও রয়েছে। বিকালের দিকে রঙ বেরঙের পোশাক পরা বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ভীড়—তাদের পোশাকের রঙ ফুলের রঙের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে। সন্ধ্যাবেলা আমাদের গাড়ি করে শহরটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল। দেখলাম নিয়ন্‌ লাইটের ছড়াছড়ি। আধা শহরটাই যেন রাত্তির বেলার চৌরঙ্গী—লাল-নীল-সবুজ-বেগুনী আলোর 'সাইন বোর্ড' প্রত্যেক দোকানে—আলোর বিজ্ঞাপন অগুণ্‌তি।

দ্বিতীয় দিন সকালবেলা শহরটাকে একটু প্রদক্ষিণ করে একটি হাসপাতাল দেখতে গেলাম। হাসপাতালটির নাম 'স্যানাটোরিয়াম্ অব্ জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন ফর ওয়ার্কার্স'—নাম শুনলেই বোঝা যায় শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্যই বিশেষ ক'রে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হ'য়েছে। দু'শো বেড্—আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ১৭১টি রোগী চিকিৎসাধীন ছিল। নয়জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও আঠাশ জন নার্স রোগীদের পরিচর্যা করেন। 'লেবার ইন্সিওরেন্স ফাণ্ড' থেকে এই 'স্যানাটোরিয়াম'-এর খরচ চলে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ যা খরচ হয় তার শতকরা তিন ভাগ প্রতিষ্ঠানের লাভের অঙ্ক থেকে কাটা গিয়ে এই 'ফাণ্ডে' জমা পড়ে। রোগীদের কোন খরচ নেই।

হাসপাতালে নানা ধরনের রোগী। কারো হাত ভাঙ্গা, কারো বা পা ভাঙ্গা, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঘোরাফেরা করছেন। যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসারও ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেখানে রোগীরা বেশ আনন্দেই আছেন। ওঁদের জন্যে ঘরের ভেতরে বসে খেলবার সরঞ্জাম যথেষ্ট রয়েছে। যাঁরা প্রায় সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন তাঁদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। ওখানকার এক ডাক্তারের কাছে শচীনদা আমার ব্যারাম সম্বন্ধে একটু পরামর্শ চাইলেন। বুড়ো ডাক্তারবাবু একটু ভেবে বললেন যে, আলুর রস খাইয়ে নাকি ওখানকার অনেক পেটের গোলমালের রোগীকে তিনি ভালো করে দিয়েছেন। আমি অবশ্যি এই উপদেশ গ্রহণ করিনি। এমনিতেই আমাদের তত্ত্বাবধায়কেরা আমাদের নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিলেন। তারপরে আবার আর একটা বোঝা ওঁদের কাঁধে চাপাতে বেশ সঙ্কোচ বোধ করলাম, কারণ একটুতেই ওঁরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পুরো হাসপাতালটি দেখা হয়ে যাবার পর আমাদের গান বাজনা শোনবার জন্যে ওখানকার রোগীরা একটু আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমরাও রাজী হয়ে গেলাম। খবর পেয়ে এক মিনিটের মধ্যেই

হাসপাতালের সামনের উঠোনটা রোগী ভর্তি হয়ে গেল। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান, তার মধ্যে ছিলো সুরিন্দরের গান, দিলীপের গান, গোপাল-কৃষ্ণের নাচ, কথাকলি দলের ছোট একটি নাচ—আমার শরীরটা খারাপ ছিলো বলে ভেবেছিলাম গাইবো না কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাইতে হলো। রোগীরা যে সব খুব খুশী হলেন, তা' বেশ বোঝা গেল। বলা বাহুল্য আমাদেরও বেশ ভালো লেগেছিলো।

এর পরের দিন গেলাম 'সেন্ট্রাল মিউজিকাল কনজারভেটরী" দেখতে। নামটা শুনে প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি। গিয়ে বুঝলাম ওটা আসলে একটা গান বাজনার ইস্কুল; গরমের ছুটি ছিলো বলে ইস্কুলের কাজ তখন বন্ধ; কিন্তু কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী হস্টেলে তখনো ছিলো। প্রথমেই ওদের একটা লাইব্রেরি দেখলাম। সেখানে খ্রীস্টপূর্ব দু-হাজার দুশো বছরের থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে চীনে যতো বই লেখা হয়েছে সবই সংগ্রহ করা আছে। পুঁথিপত্র ঘেঁটে ওঁরা বার করেছেন যে খ্রীস্টপূর্ব পাঁচশো একান্নতে চীনে প্রথম স্বরলিপির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিলো। তখনকার বইগুলি ছিলো বাঁশের চিল্‌তের তৈরী। সেই সব পুরানো স্বরলিপির চলন এখন অবশ্যি নেই। প্রায় একশো বছর হ'লো ওদেশে আন্ত-র্জাতিক স্বরলিপির ব্যবহার হচ্ছে। সুরসম্পাত (হারমোনাইজেশন্) সম্বন্ধে একটি চৈনিক পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করা হয়েছিলো খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। লাইব্রেরির আরেকটি ঘরে হরেক রকম বাদ্যযন্ত্র সযত্নে রক্ষিত। হাজার হাজার বছর আগে চীনে যে ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হোত সেগুলি এখনও চলে কি-না জানি না। আজকাল

যে ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির নমুনাও কিছু কিছু রাখা আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রথম ঢুকে শুনলাম এটি একটি গানের স্কুল—লাইব্রেরির ঘর ক'টি দেখে মনে হ'ল এটা যেন একটা গানের যাত্নঘর! প্রায় চার হাজার বছর আগেকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টেনে এনে বর্তমান কালের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত করার মধ্যে যে অসামান্য বাহাত্নরি আছে তা' স্বীকার না করে উপায় নেই। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচশো একান্নতে চীনে স্বরলিপির ব্যবহার চলতো জেনে আশ্চর্য হ'য়েছি; কারণ এই সময়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে স্বরলিপি-জাতীয় কোন পদ্ধতি ছিল কিনা তা' আমার জানা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় চীনদেশ যে কতদূর এগিয়ে গিয়েছিলো তা' ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। আমাদের দলে ইতিহাসের কোন ছাত্র থাকলে আমার মনে হয় এ বিষয়ে আরো বেশী তথ্য দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করা যেতো। একটি গানের স্কুলে হাজার হাজার বছরের পুরানো পুঁথিপত্র ও বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আমার ধারণাতীত।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে একটি বড় ঘরে এসে হাজির হলাম। লেমনেড্ আইসক্রীম সোডা প্রভৃতি পানীয়ের ব্যবস্থা সব জায়গাতেই আছে। ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হ'ল। স্কুলের ত্নটি ছাত্রী বেহালা ও পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো। ওদের বাজনা শোনবার মত। বেহালাটি বাজালো একটি ছোট মেয়ে—যেমন মিষ্টি তার হাত তেমনি তার সুরের জ্ঞান। ওর বাজাবার ঢংএ কোন জড়তা নেই, এই অল্পবয়সেই সে যে ধরনের দক্ষতা দেখালো তাতে মনে হোল ভবিষ্যতে সে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী হয়ে উঠবেই। ত্নটি মেয়ের কণ্ঠসঙ্গীত শুনে অপরিসীম আনন্দ পেয়েছি—ওদের নাম লী-শিয়েন্ ও চেন্-ইউও। চেন্-ইউও গাইলো চীনের বিখ্যাত ফিল্ম 'হোয়াইট্ হেয়ার্ড গার্ল'এর একটি গান। যদিও এখনও ছাত্রী, ওদের ত্নজনেরই গলা এরই মধ্যে আশ্চর্য রকম তৈরী হ'য়ে

গিয়েছে—কি ক'রে যে এই অল্পবয়সেই গানগুলিকে এত প্রাণবন্ত করে তোলে ভেবে পাইনি। গানের ভাবের প্রকাশভঙ্গী নিখুঁত, ওদের গানে ভুল করা নেই, ঠেকে যাওয়া নেই, ঢোক গেলা নেই—কোন প্রকার আড়ষ্টতার ভাব নেই। ওদের দমের জোর দেখে অবাক হয়েছি। একটি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শোনালেন এক যুবক। যন্ত্রটির নাম 'চং'—অনেকগুলি তার, আওয়াজটা আমাদের সরোদের আওয়াজের মত খানিকটা। চীনের লোকসঙ্গীতের সুর বাঁশী বাজিয়ে শোনালেন একজন। সবার শেষে সবাই মিলে একটি ফটোগ্রাফ তুলে বিদায় নিলাম।

পয়লা অগাস্ট থেকে ৫ই পর্যন্ত তিয়েনসিনে থাকতে হ'য়েছিল—এর মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান ছিল দু'দিন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। সেদিন ৪ঠা অগাস্ট। সকাল বেলা বিলায়েৎ হোসেন খান-কে বললাম, 'আমি আজ একটি খুব মিষ্টি সুরের রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইব। আমার সঙ্গে একটু সেতার বাজিয়ে দিলে গানটি খুব ভাল হবে।' ও প্রথমে রাজী হল না—বললে, 'আমি কী কারো গানের সঙ্গে বাজাবার জন্যে এসেছি?' বুঝিয়ে বললাম, 'দল বেঁধে বাইরে এসেছি, পরস্পরের সাহায্য করা উচিত। আমি যে হীরাবাঈ জ্যোৎস্না ভোলে ও দিলীপের গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাই তাতে কি প্রমাণ হয় যে আমি ওদের বাজিয়ে হয়ে এসেছি?' আমার কথা শুনে ও বললে, 'ঠিক আছে দাদা, আমি বাজাব।' সারা দুপুর আমার সঙ্গে রিহার্সাল করেছিলো। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে বাজালো। আমার গানটি ছিল 'তোমার হ'ল সুরু আমার হ'ল

সারা'। প্রথমে বিলায়েৎকে একটু ইমনের আলাপ দিয়ে আরম্ভ করতে বললাম—তারপর সুরু হ'ল গান—প্রথম অন্তরা শেষ করবার পর আবার সেতারের কাজ চললো। কিছু সেতার বাজনার পর আবার গান—অনুষ্ঠানটি বেশ জমে উঠেছিল। শেষ হয়ে যাবার পর বিলায়েৎ ভীষণ খুশী—ওর নিজেরও খুব ভাল লেগেছে। আমার শিল্পী জীবনে এই অনুষ্ঠানটি একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীরা সাধারণতঃ একটু তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা বিদেশ গিয়ে—বিশেষ ক'রে চীনের মত দেশে গিয়ে সমষ্টিগত শিল্পসৃষ্টির গুরুত্ব যে উপলব্ধি করতে পারেন এটা খুব বড় আশার কথা।

পিকিং থেকে তিয়েনসিন যাবার সময় আমাদের জন্যে একটি অদ্ভুত ধরনের গাড়ী ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হ'ল। গাড়ীটা লম্বা—ত্ব'ধারে চেয়ার পাতা, ত্বটো চেয়ারের মাঝখানে একটি করে ছোট টেবিল। কয়েক ঘণ্টার রাস্তা বলেই এই গাড়ীটির ব্যবস্থা। তিয়েনসিন ছেড়ে চলে যাবার পর এ গাড়ীটিকে আর দেখতে পাইনি। তবে ওখান থেকে আরেকটি নতুন গাড়ী দেওয়া হ'ল আমাদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। পিকিং-এ জিনিসপত্র কেনাকাটির ফলে আমাদের মালপত্রের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল, তাছাড়া মঞ্চ সাজাবার উপকরণগুলিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'য়েছিল—তাই আরেকটি গাড়ীর দরকার হ'ল। এই মালপত্রের গাড়ীর একদিকে ট্রেনের 'গার্ডের' জন্যে একটি ছোট কামরা এবং সামনে একটি ছোট বারান্দার মত জায়গা। বেশ খোলা-মেলা দেখে তিয়েনসিন থেকেই ঐ কামরাটি দখল ক'রে ফেললাম। এর পর থেকে গরমে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। ৫ই অগাস্ট বেলা প্রায় একটার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়লো—পরের দিন সকাল বেলা ইয়াংসি নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম—বিরাট নদী—ট্রেনটা

দু'ভাগ করে একটি জাহাজের উপর তুলে দিয়ে নদী পার হলাম—বেলা প্রায় দশটায় হ্যানকিং পৌঁছে গেলাম। শহরটি বহুদিনকার—এককালে নাকি চিয়াং কাইশেকের রাজধানী ছিল এখানে। হোটেলে পৌঁছেই গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নতুন নাচের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে রিহার্সাল-এর ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হ্যানকিংএ আমাদের অনুষ্ঠান ছিল দু'দিন। দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছিল সান-ইয়াৎ সেনের সমাধি, ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম, একটি লোকশিল্প প্রদর্শনী এবং 'ইউ হুয়া তাই' নামে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ। ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম বা যাদুঘরে এত পুরানো জিনিসপত্রের ভীড় যে মনে করে রাখা অসম্ভব। এই যাদুঘরের পরিচালনার ভার একটি মহিলার ওপর ন্যস্ত, মহিলাটি নিজে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। উনি আমাদের অনুষ্ঠানেও একদিন উপস্থিত ছিলেন। ওঁর কাছে একটি নটরাজের মূর্তি ছিল কিন্তু ঐ মূর্তির কোন অর্থ তিনি এতকাল খুঁজে পান নি—গোপালকৃষ্ণের 'শিবনৃত্য' দেখবার পর নটরাজের ভঙ্গীটি তাঁর একটু বোধগম্য হয়েছে এবং সেজন্য গোপালকে তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। যাদুঘরে বিশিষ্ট পরিদর্শকদের জন্য কয়েকটি খাতা রাখা আছে—সেই খাতাগুলিতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হাতের লেখা দেখতে পেয়ে ভারী মজা লাগছিলো—দেশ বিদেশের নাম করা লোকদের স্বাক্ষর হ্যানকিংএর যাদুঘরের একটি খাতায়—কয়েকশো বছর পরে এই খাতাটি হয়তো যাদুঘরের এক জায়গায় একটি সুসজ্জিত কাঁচের আলমারীতে স্থান পাবে।

ব্যাপারটা কল্পনা করতেও বেশ মজা লাগছিল—নিজের নামটি সুন্দর করে লিখেছিলাম, চিন্‌তে নিশ্চয়ই কেউ তখন পারবে না, তবু নামটি তো রইল!

শহরের বাইরে খানিকটা গিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। কথিত আছে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়ুন্ ক্যোয়াং নামক একজন বৌদ্ধ

ধর্মযাজক এই পাহাড়গুলির একটিতে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে-ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে বুদ্ধের শান্তির বাণী শুনে দেবতারা পর্যন্ত এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। সেই থেকে এই জায়গাটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান বলে পরিচিত ছিল এবং স্থানটির নামকরণ করা হ'য়েছিল 'ইউ হুয়া তাই' অর্থাৎ পুষ্পবৃষ্টির বেদী। এহেন শান্তির পীঠস্থানটি ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে হ'য়ে উঠলো চিয়াং কাইশেকের জল্লাদদের নারকীয় কার্যকলাপের রঙ্গমঞ্চ। চিয়াং-এর বাইশ বছরের শাসনকালের ভেতরে প্রায় এক লক্ষ দেশপ্রেমিককে এখানে হত্যা করা হ'য়েছিল। এই দেশপ্রেমিকদের মধ্যে ছিলেন প্রগতি ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বহু ছাত্র-ছাত্রী, বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মী এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বহু সভ্য। প্রথম দিকে দিনের আলোতেই এই হত্যাকাণ্ড চলতো, কিন্তু এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে দিন দিন জনমত গড়ে ওঠার ফলে চিয়াং-এর দল গভীর রাত্রে গোপনে হত্যার কাজ সমাধা করে ফেলতো। বীর শহিদদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া গেল ন্যানকিং-এর শান্তি কমিটির একজন নেতা মিঃ চ্যাং-এর কাছ থেকে।

১। শহিদ ইয়ুন তাই-ইং ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন শক্তিমান নেতা। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে আন্দোলনের পর থেকে তাঁর নেতৃত্বে চীনের যুবসমাজের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হ'য়েছিল। দেশের যুবশক্তিকে সংহত করবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট যুবসংঘ (Communist Youth League) নামে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে তিনি চীনের যুবসমাজের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হ'য়ে উঠেছিলেন। ন্যানকিং-এ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের পয়লা অগাস্ট-এ যে বিদ্রোহ হ'য়েছিল তার একজন প্রধান নেতা ছিলেন ইয়ুন তাই-ইং। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে কুয়োমিণ্টাং ঘাতকদের হাতে তাঁর প্রাণহানি হয়।

২। তেং চুং-শিয়া ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে সাংহাই-এ জাপবিরোধী আন্দোলনের কাজে সংশ্লিষ্ট থাকা অবস্থাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ন্যানকিং-এ এনে হত্যা করা হয়।

৩। উত্তর-পূর্ব চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা লো তেং-সিয়েন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সাংহাইএ বস্ত্রশিল্প শ্রমিক আন্দোলনের সময় (১৯৩৩) তিনি ধৃত হন এবং শেষে 'ইউ হুয়া তাই'এ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

এই ধরনের আরো কয়েকটি মূল্যবান জীবন কি ভাবে অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল তার করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের দলের প্রত্যেকেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। মিঃ টং দোভাষীর কাজ করতে করতে খুব বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। সবার শেষে 'সুন সিন-চুয়ান্'এর কাহিনী শুনলাম। তিনি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দেই ন্যানকিং পার্টির সেক্রেটারী হবার সম্মান লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'ইউ হুয়া-তাই'এ খুন করবার জন্য যখন তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন, 'তোমরা যদি আমাদের একজনকে গুলী করে মারো, তার জায়গায় দশ জন দাঁড়াবে, আর যদি দশ জনকে মারো তবে একশো' জন সেই জায়গা পূরণ করবে—আমাদের হাজার হাজার বিপ্লবীকে সমূলে ধ্বংস করতে তোমরা কখনোই পারবে না—কিছুতেই পারবে না।'

চীন বিপ্লবের বীর শহিদদের স্মৃতিকল্পে একটি অপূর্ব সুন্দর স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে এই 'ইউ হুয়া তাই'এ। ভবিষ্যতে জনসাধারণের জন্যে একটি 'পার্ক' তৈরী করবার পরিকল্পনা ওদের আছে। ভারতীয়

শিল্পীদের পক্ষ থেকে একটি বিরাট পুষ্পমাল্য শহিদদের উদ্দেশে অর্পণ করা হোল।

'ইউ হুয়া তাই' থেকে ফেরবার পথে 'ওয়ার্কার্স কালচারাল প্যালেস' নামে একটি বাড়ীতে একটি লোকশিল্প প্রদর্শনী দেখে এলাম। হাতের সূক্ষ্ম কাজের নানা ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি ঘরে এমব্রয়ডারীর ও ব্রোকেডের কাজ সাজানো রয়েছে। দ্বিতীয় ঘরে মৃৎশিল্পের নমুনা। মাটির ফুলদানি, বাসনপত্র, পুতুল, ফুল, ফল, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি শাক সব্জী পর্যন্ত সবই আছে। আরেকটি ঘরে ছবি—আমাদের দেশে ছবির প্রদর্শনীতে যেরকম ছবি সাজানো থাকে সেই ধরনেরই তবে ছবির সংখ্যা তত বেশী নেই। অন্য একটি ঘরে রঙ্গীন সিল্কের সূতোর কাজ ও কাগজ কেটে ছবির কাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঝখানে একটি বড ঘরে কাঠ খোদাইএর কাজ, বাঁশের ওপরে খোদাই-এর কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, গালার কাজ প্রভৃতি নানা ধরনের সূক্ষ্ম শিল্পসৃষ্টির নমুনা সংরক্ষিত আছে। একটি হাতির দাঁতের পাখার ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার মত। একটি তিব্বতী জলপাই-এর দেড় ইঞ্চি লম্বা বীচিটাকে খোদাই করে একটি বজরা তৈরী করা হ'য়েছে, বজরার গায়ে নানা রকম খোদাই করা। কাজগুলি এত সূক্ষ্ম যে, আতস কাঁচ দিয়ে না দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না।

কুয়োমিণ্টাং শাসনের আমলে ওদেশের কুটীর শিল্প ও লোকশিল্পের কী হাল হ'য়েছিল তা' আমার জানা নেই—বৃটিশ শাসনের দৌরাত্ম্যে আমাদের দেশের লোকশিল্পের দুর্গতির কথা তো আমরা জানি—তাই আমার মনে হ'ল ওদেশেও হয়তো সেই ধরনের অবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া এত আগ্রহ করে লোকশিল্পকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার মধ্যে একটা পুনরুদ্ধারের ভাব আছে। নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পর বড় বড় কারখানা গড়ে তুলে সমস্ত দেশটাকে শিল্পায়িত

করে তোলবার দিকে ওঁরা মনোযোগ তো দিয়েছেনই—সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্প ও লোকশিল্প পুনরুদ্ধারের গুরুত্বও ওঁদের নজর এড়ায়নি।

ন্যান্‌কিং থেকে সাংহাই ট্রেনে ছয় ঘণ্টার পথ। সকালবেলা সাড়ে-সাতটায় রওনা হয়ে বেলা প্রায় দেড়টায় সাংহাই পৌঁছে গেলাম। একটা হোটেলে আট তলায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। পিকিং থেকে একদল দোভাষী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, সাংহাই-এর রাস্তাঘাট ওঁদের পরিচিত নয় বলে ওখানকার শান্তি কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একদল দোভাষী আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। ওরাও সব অল্পবয়স্ক—আঠারো উনিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে, গুণের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ওরাও পিকিং-এর দোভাষীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমাদের চরিত্র, আমাদের রুচি ও মেজাজ সম্বন্ধে সমস্ত খবর পিকিং-এর কর্মীদের মুখ থেকে শুনে ওরা যে ভাবে কাজ করতে লাগলো তাতে মনে হোল ওরা যেন অনেক দিন থেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে।

বিকালের দিকে বেড়াবার ও শহর দেখবার ব্যবস্থা। যেদিন সাংহাইয়ে পৌঁছালাম সেদিন বিকালবেলা বেরিয়েছি—হঠাৎ দেখি আমাদের গাড়ীগুলি যেন শহরের বাইরে চলে এলো। সাংহাই-এর একজন কর্মী চু-ইউয়ান পাশে বসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, জায়গাটির নাম সাও ইয়াং—চীনের নতুন সরকার এখানে

নতুন ঘর বাড়ি তুলে দিচ্ছেন। বিরাট বিরাট অনেকগুলি বাড়ী। বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে তৈরী বাড়িগুলির সামনে কিছুটা জায়গা ফাঁকা, তাতে সবুজ ঘাসের কার্পেট—মোড়া পেতে মায়েরা কেউ বসে আছেন, কেউ বা কিছু বুনছেন, সুন্দর পোশাক পরা বাচ্চারা ঘাসের ওপরে খেলছে, লুটোপুটি খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তখনকার দিনে যাদের পায়ে ছিল না জুতো, গায়ে ছিল নোংরা ও ছেঁড়া কাপড়, ঘরের চালের ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো আর বৃষ্টির জল সমানভাবে যারা ভোগ করতো তাদেরই জন্যে এই ব্যবস্থা। জানালা দিয়ে ঘরের আসবাবপত্রের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল—সেগুলি সাধারণ মানুষের যেটুকু সম্পত্তি থাকতে পারে তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। হোগলা আর টালির কুঁড়ে ঘরে গরু আর ভেড়ার পালের মত জীবন ধারণ করার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের গৌরব আছে সেটা ওরা মেনে নিতে নারাজ। আলো বাতাস জল যেমন সকলের—আবার এদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচবার অধিকারও সকলেরই থাকা উচিত। তাই শহরের চার কোণে এই ধরনের বড় বড় দালান বানিয়ে সাংহাই-এর একুশ হাজার শ্রমিক পরিবার যাতে আরামে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শহরের যে কোণটাতে আমরা গিয়েছিলাম সেদিককার প্রথম কিস্তির ঘর-বাড়ী তৈরী করার কাজ শুরু হয় ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এবং বছর শেষ হবার আগেই সেই কাজ শেষ হ'য়ে যায়। দ্বিতীয় কিস্তি ধরা হয়েছিল ১৯৫২-এর অগাস্ট মাসে এবং ১৯৫৩-এর মে মাসের মধ্যে পুরো কাজ সম্পূর্ণ হ'য়ে যায়। এই কাজে হাত দেবার আগে প্রথমে সাংহাই মিউনিসিপ্যাল কনষ্ট্রাকশন প্ল্যানিং কোম্পানী একটি খেলনা গোছের বাড়ী তৈরী করে। এটিকে ভাল করে দেখে যাবার জন্যে শ্রমিকদের ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদের মতামত জিজ্ঞেস করা হয়। যাদের

জন্যে বাড়ী তারা তো মানুষ, তারা কি ভাবে থাকবে তাদের কি সুবিধে আর কি অসুবিধে সব জেনে আবার নতুন করে বাড়ীর মডেল তৈরী হল। শ্রমিকদের পরামর্শ এবং সাহায্য নেওয়া হয়েছিল বলেই কম খরচে খুব মজবুত ধরনের বাড়ী অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করে ফেলা সম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। এমন অদ্ভুত কায়দায় বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছে যে শীতকালে প্রত্যেকটি বাড়ীতেই দিনে ছয় ঘণ্টা সূর্যের আলো পাবার সুবিধে আছে। মোট ৭৭০টি বাড়ীতে ৫৯০২টি পরিবার ইতিমধ্যে বসবাস শুরু করেছে।

বিদেশীদের তাক লাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই বিরাট ব্যাপারটি সাজিয়ে যদি রেখেই থাকে তো এই সাজাবার কাজটিকেও তারিফ করতে হয়। প্রত্যেক মাসেই তো ওদেশে বিদেশীদের ভিড় লেগে আছে—নতুন বাড়ীর বাসিন্দাদেরও খুব মজা। দিব্যি আরামে আছে। এত পয়সা খরচ করে সাজিয়ে রাখবার ব্যাপারটি অন্যান্য দেশে হয় না কেন ভাবি। তাছাড়া তাক্ লাগানোর জন্যে ওদেরই বা কেন এত মাথা ব্যথা? শুধু কি বাড়ী? আনুষঙ্গিক মেলা ব্যাপার এরই মধ্যে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। শুধু থাকা খাওয়াটাই মানুষের সব চেয়ে বড় কথা নয়। প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থার চেষ্টা চলেছে। বাচ্চাদের শিক্ষার জন্যে একটি নার্সারী, তুটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, বড় ছেলেমেয়েদের জন্য চারটে স্কুল খোলা হয়েছে এই গ্রামে। একটি 'কালচারাল হল' আছে, তার ভেতর লাইব্রেরি ও ক্লাব। তাছাড়া একটি সমবায় দোকান ঘর, তিনটি বাজার, একটি ব্যাঙ্ক ও একটি পোস্টাফিসও খোলা হয়েছে। অনেক লোক একসঙ্গে স্নান করতে পারে এমন স্নানাগার তিনটি। শীতকালে গরম জল সরবরাহ করার জন্যে কয়েকটি কেন্দ্রের ব্যবস্থাও আছে। একটি 'ক্লিনিক সেণ্টার'এ স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি তদারক করা হচ্ছে। নেই শুধু একটি হাসপাতাল আর একটি সিনেমা হল—তার জন্য

অবশ্যি জায়গা ঠিক করা আছে—বাড়ী তৈরী করার কাজটি বাকী ছিল। এতোদিনে বোধ হয় আর বাকী নেই।

কুয়োমিণ্টাং-এর আমলে ওদেশের শ্রমিকদের অবস্থা যা ছিল তা এখানে উল্লেখ করে আর কি লাভ হবে। এক কথায় ওদের কিছুই ছিল না। এখন যা হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোল—এই নতুন ঘরবাড়ির ভাড়া বাবদ ওদের আয়ের শতকরা পাঁচভাগ ব্যয় হয়—আগে হোত পঞ্চাশ ভাগ। এখন এক-একটি শ্রমিকের গড়পড়তা মাসিক আয় আমাদের দেশের টাকার অঙ্কে প্রায় একশো কুড়ি থেকে একশো চল্লিশ টাকার মতো।

নতুন বাড়িতে বাস করবার সুযোগ কে বা কারা আগে পাবে এ নিয়ে ওদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি অনেক জল্পনা কল্পনা আলোচনা করে তুটি নিয়ম বার করেছে। প্রথম নিয়মটি হোল কাজে যারা সবচাইতে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে তাদেরই নতুন বাড়িতে যাবার অধিকার জন্মাবে। আর তা ছাড়া যাদের ঘর আছে অথচ ঘরে থাকার সুবিধেটি নেই—যেমন ঘরের একদিকের চাল নেই, যেটুকু আছে সেইটুকুও ফুটো, কিম্বা তুদিকের বেড়াই নেই—এই ধরনের গৃহীদের উদ্ধার করে নিয়ে নতুন বাড়িতে চালান করার ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজের দক্ষতার বিচার করবার ভার অবশ্যি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির ওপরই ন্যস্ত। এই বিচার সবাই মাথা পেতে মেনে নেয়, কিন্তু তা বলে তু'-একটা বিদ্রোহের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। হুন্ পে-ল্যান্ নামে একটি মহিলা কর্মী তাঁর নিজের কাজে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়ে আদর্শ শ্রমিক হ'য়ে ওঠবার সম্মান অর্জন করেছিলেন। প্রথম নিয়মটি অনুসারে তাঁর জন্যে একটি নতুন বাড়ীর ব্যবস্থা হোল। কিন্তু তিনি যেতে রাজী হলেন না। যে কারণে রাজী হলেন না সে কারণটি অত্যন্ত সাধারণ, তাঁর জানাশোনা আরেকটি কর্মীর বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর—তাই নিজের পাওনা সুবিধেটুকু অন্য কর্মীটির সুবিধার্থে ছেড়ে

দিলেন। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন কি করে সম্ভব হয় ভেবে পাইনি।

চীন দেশের বিপ্লবী সাহিত্যিক লু শুন-এর কথা আগে দু'একবার উল্লেখ করেছি। লু শুন্-এর নাম কলকাতার প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক-দের মুখে যে শুনিনি, এমন নয়। পিকিং শহরে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাঝে মাঝে লু শুন্-এর নামের উল্লেখও দু'-একবার শোনা গেছে, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় পেলাম সাংহাইয়ে গিয়ে। লু শুন সাংহাই শহরে যে বাড়ীটাতে দশ বছর আত্মগোপন করে ছিলেন, সেই বাড়ীটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল বলেই তাঁর সম্পর্কে এমন অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছিলাম, যার সম্বন্ধে আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। বাড়ীটাকে ওরা অতি সযত্নে মিউজিয়ামের মতো সাজিয়ে রেখেছে। লু শুন-এর গ্রন্থাবলী, চিঠিপত্র, পেনসিল, কলম, তুলি ইত্যাদি জিনিসপত্র কয়েকটি কাঁচের আলমারীতে রাখা হয়েছে। তখনকার দিনে জনসেবার কাজে যে অর্থ সংগ্রহ করা হোত তার রসিদ বইয়ের দু'একটি পাতাও সেই আলমারীতে স্থান পেয়েছে। তাঁর বিছানাপত্র, টেবিল চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি আসবাবপত্র, তিনি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরেই, যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। কতকগুলি স্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে কিছু কাঠ বোঝাই

করা ছিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওই কাঠগুলি ছবি খোদাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাভাবের দরুণ যেসব শিল্পী এই কাঠ কিনতে পারতেন না, তাঁদের জন্য লু শুন কাঠ কিনে বিতরণ করতেন। লু শুন-এর মৃত্যুর পরে এই ধরনের কাঠ যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলিকেও বাক্সবন্দী করে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে।

চীনে নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই লু শুন-এর মৃত্যু হয়েছিল বটে, কিন্তু তবু যে মনীষীদের অবদানে চীন বিপ্লব সার্থক হ'য়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে লু শুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। মনীষী হিসাবে তাঁর বিরাট প্রতিভার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ সাংস্কৃতিক কর্মীর মুখেই লু শুন-এর নামোল্লেখ শুনে তাঁর সম্বন্ধে জানবার একটা কৌতূহল বোধ করেছি। যাঁদের সঙ্গেই লু শুন সম্বন্ধে আলাপ করেছি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই শুনতাম যে লু শুন ছিলেন 'চীন দেশের গোর্কী'। লু শুন-এর সাহিত্য এবং চিন্তাধারায় যে নির্দেশ ছিল. তা একটা বিপুল অনুপ্রেরণা দিয়েছিল চীন দেশের সমস্ত বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে এবং তাঁর সাহিত্যের ক্রমবিকাশও ঘটেছিল চীনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে।

চীনের নতুন সভ্যতা ও কৃষ্টির পথপ্রদর্শক ছিলেন বলে লু শুন মাও সেতুং-এর অসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তিনি ছিলেন না বটে কিন্তু চীনের সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আমলা-তান্ত্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সাহিত্যিক সংঘের যে বিরাট সংগ্রাম পরিচালিত হ'য়েছিল এবং যে কঠোর সংগ্রামের ফলে বিপ্লব সফল হ'য়ে উঠেছিলো সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিলেন লু শুন। এই কারণেই চেয়ারম্যান মাও তাঁকে 'নন্-পার্টি বলশেভিক' আখ্যা দিয়ে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। চীনের যুবশক্তিকে বিপ্লবের কাজে আকৃষ্ট করে তোলার মূলেও ছিলেন লু শুন। দুঃস্থ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের

প্রতি মমতা ছিল তাঁর অগাধ। নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ এবং তাঁর কার্যে আস্থাবান ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি ব্যয় করতেন দেশসেবার কাজে। দুঃস্থ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁদের শিল্পপ্রতিভার বিকাশের নানা সুযোগ-সুবিধা তিনি আজীবন করে গিয়েছিলেন। লু শুনের এক-জন বন্ধু ও সহকর্মী এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে—চীনে ভারতবর্ষের প্রগতিমূলক সাহিত্যের প্রবেশ নিষেধের সরকারী বিধি ব্যবস্থার জন্য লু শুন তাঁর কাছে প্রায়ই দুঃখ করতেন।

লু শুন বেঁচে ছিলেন ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এবং মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৫৫ বৎসর। যে স্বাধীন সুখী চীনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা সফল ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে তিনি সারাজীবন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সেই স্বপ্ন সফল হয়ে ওঠেনি বটে কিন্তু তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়ে গভীর মানবতাবোধের যে পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তা দলমত-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি চীনবাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল বলেই তাঁর মৃত্যুর পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রচণ্ড দমননীতির ফলে চীনের বিপ্লবী আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরে সমস্ত বামপন্থী দল তাঁর শব-যাত্রার মিছিলে যোগদান করায় যে ঐক্য গড়ে ওঠে সেই ঐক্যের ফলেই বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সমস্ত দেশে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাই আজ চীনের জনসাধারণের কাছে লু শুন্ অমর। সেদিন লু শুনের ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবন কাহিনী শুনতে শুনতে একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য উপলব্ধি করছিলাম এবং সেই মুহূর্তগুলি আমার হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল তা প্রকাশ করার মত ভাষা খুঁজে পাইনে।

ন্যান্‌কিং শহরে আমাদের দলের 'যুদ্ধ ও শান্তি' নাচটি ওখানকার দর্শকদের অকৃপণ প্রশংসা লাভ করার ব্যাপারটি বোম্বাই-এর কথক নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী দময়ন্তী যোশীর প্রাণেও বেশ নাড়া দিয়েছিলো। তাই তাঁরও ওই ধরনের একটি নাচের অনুষ্ঠান দেখাবার ভারী সখ হ'ল। আমাকে বললেন, 'হাম্‌কো কুছ দিজিয়ে দাদা।' আমি বললাম, 'সাংহাইয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' সাংহাই-এ পৌঁছেই শ্রীমতী যোশী আমায় তাগাদা দিলেন—আমার ঘরেই ছুদিন রিহার্সাল হ'ল। দময়ন্তী একলাই নাচবেন—সঙ্গে আমি গাইব রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যের তালে তালে' গানটি। নাচের নাম দিলাম 'লিবারেশন অফ ম্যান' অর্থাৎ 'মানুষের মুক্তি'। ল্যু-ওয়ান-জু'কে ডেকে নাচের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গানটির একটি ছোটখাটো ব্যাখ্যা লিখে দিলাম, চীনে ভাষায় ঘোষণা করার জন্যে। নাচটি তৈরী হ'ল অপূর্ব। অনুষ্ঠানের আগে দময়ন্তীকে জানিয়ে রেখেছিলাম যে এই নাচ চীনের দর্শকরা খুব পছন্দ করবে এবং আবার করার জন্যে অনুরোধ করবে; যদি দ্বিতীয়বার করতে হয় তা'হলে কোন অংশ থেকে আবার শুরু করা হবে তাও জানিয়ে

রেখেছিলাম। হ'লও তাই। বিপুল উল্লাসের মধ্যে 'লিবারেশন অফ ম্যান' নাচটি শেষ হ'য়ে যাবার পর দর্শকদের অনুরোধে আবার অনুষ্ঠানটি দেখাতে হ'ল। নাচের ছন্দে ও গানের সুরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছিল বলে নাচের বিষয়বস্তুর বিশেষ আবেদনটি দর্শকদের চিত্তে প্রভূত উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। নাচটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠবার মূলে আরেকটি কারণ হচ্ছে 'ট্যাগোল্'—মানে 'ট্যাগোর'—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ। (আমাদের 'র' বর্ণটি ওদের মুখে উচ্চারিত হলে 'ল' হয়ে বেরিয়ে আসে, ফলে ওদের মুখে আমার নামটি হয়ে যায় 'ডেবাল্লাটা'।) রবীন্দ্রনাথের প্রতি ওদের অপরিসীম শ্রদ্ধা। যেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করতে বসেছি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেই দর্শকরা বেশ নড়ে চড়ে বসেছেন এবং আকুল আগ্রহে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবার জন্য অপেক্ষা করেছেন।

চীনদেশে ভারতবর্ষের যে চব্বিশটি বই চীনে ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে তার মধ্যে বাইশটিই রবীন্দ্রনাথের। কাজে কাজেই নাচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান শুনবার ঔৎসুক্য ওদের প্রবল। তাই এই অনুষ্ঠানটি দেখে ওরা যে কি পরিমাণে মুগ্ধ হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পকলার সৌন্দর্যবোধ ওদের অস্থিতে মজ্জায়—তাই ভারতীয় চারু শিল্পের সূক্ষ্ম রসও ওরা গ্রহণ করতে সক্ষম এবং তাতে ওরা গভীর আনন্দ পায়। দেশ থেকে নিরানন্দ ঘুচে গেছে বলে জীবনের সব সহজ আনন্দই ওরা পুরোপুরি ভোগ করতে শিখেছে। ওদের আনন্দে মেতে ওঠার ব্যাপার দেখলে ওদের প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন বিকেল বেলা গিয়েছিলাম একটি বাচ্চাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেখতে। গাড়ী থেকে নেমেই দেখতে পেলাম ত্রিশ চল্লিশটি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে একদল ছেলে-মেয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে আসছে—একটু কান লাগিয়ে শুনলাম আমাদের 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই'

গানটির প্রথম লাইনটি বারে বারে বাজছে। ভারী মজা লাগলো। আরো কিছু ছেলে-মেয়ে গানটি গাইতে গাইতে আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। বেশ বড় 'হল'। কিছু খাওয়া দাওয়া ও আলাপ পরিচয়ের পর ওদের ছেলেমেয়েদের কিছু গান বাজনা হ'ল, মাঝে মাঝে আমাদের দলের শিল্পীরাও কিছু অনুষ্ঠান করলেন। সবার শেষে হ'ল 'হিন্দী চীনি' গান। গানটি গাইবার আগে কয়েকটি ছেলে মেয়ে ডেকে এনে দলটা ভারী করে নিলাম। গান শেষ করবার সময় লক্ষ্য করে দেখলাম ঘরের ভেতরে শ'তিনেক ছেলেমেয়ে সবাই গানটির প্রথম লাইনটি গাইতে গাইতে হাত ধরে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে—মাঝে মাঝে আমাদের শিল্পীরাও ঢুকে পড়েছেন—হঠাৎ দেখি আমাদের লীডার শচীনদা বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'বাহু তুলে নৃত্য শুরু করেছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি আর দর্শক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকিনি।

১৫ই অগাস্ট সন্ধ্যায় সাংহাই থেকে রওনা হব হ্যাংচাও, যার জন্য স্টেশনে যা কাণ্ড ঘটলো তা অনেক দিন মনে থাকবে। গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য সাংহাই শান্তি কমিটির নেতারা এবং কর্মীরা তো উপস্থিত ছিলেনই, তাছাড়া একপাল ছেলেমেয়েও এসে জুটেছে আমাদের বিদায় দেবার জন্যে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই গান গাইতে পারে; সবাই মিলে গান জুড়ে দিল। গানতো নয়, গানের মালা! একটার পর একটা চলতে লাগলো—ওদের কোন ক্লান্তি নেই। মুখে ওদের হাসি লেগেই আছে। আমাদের দলের সবাইকে ওরা যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। কেউ কারো ভাষা বুঝি না অথচ পরস্পরের প্রতি কী হৃদ্যতা! ট্রেনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি উপভোগ করছিলাম। দশবারোটি ছেলে-মেয়ে আমার সামনে এসে কী জানি বললো। দোভাষীর সাহায্যে বুঝলাম ওরা আমায় 'হিন্দী চীনি' গাইতে বলছে। রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে গান—

এখন ভাবতেও কি রকম লাগছে, কিন্তু তখন এসব কথা মনেও হয়নি—সোজা ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গান শুরু করে দিলাম। যে যার মত গলা দিয়ে আমরা গাইছি, ওরাও গাইছে—আমাদের দলে আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীরাও—সঙ্গে সঙ্গে নাচ—হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে ঘূর্ণী নৃত্য! মাস্টার কৃষ্ণন বোম্বাইয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, গোলগাল বেঁটে চেহারা, নাচতে নাচতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন—হাত ধরা ছিল বলে চিৎ হয়ে পড়েননি কিন্তু দমলেন না মোটেই—বসে বসেই গানের তালে তালে হেলতে তুলতে লাগলেন—মাঝে মাঝে বসা ভঙ্গিতেই একটু লাফালাফিও চলছিল, ব্যাপারটা যেন নাচেরই একটি অঙ্গ, এই ভাব। আমার অবস্থার কথা কি বলবো! গান গাইব, না মাস্টার কৃষ্ণনের 'উপবেশন নৃত্য' দেখব! শেষ পর্যন্ত গান বন্ধ করতে হোল, কারণ গলা দিয়ে গানের বদলে হাসির অনর্গল ফোয়ারাই বেরিয়ে আসতে লাগলো। এই দৃশ্য ভুলবার মত নয়। কোথায় সেই বয়েসের গাম্ভীর্য, আর কোথায় বা সেই শিল্পীমনের শান্ত ভাব! এইক্ষণটুকুর জন্যে আমাদের বয়েসগুলি যেন কমে কমে এমন একটা জায়গায় আটকে ছিল যেখানে সহজ আনন্দ উপভোগ করতে কোন সঙ্কোচ বা বাধা থাকে না। আমাদের সবাইকে একযোগে কোন্ সম্মোহন বিদ্যার বলে ঐ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল তা' মাঝে মাঝে ভাবি।

রাত তুটোয় হ্যাংচাও শহরে পৌঁছে গেলাম—সেখানেও দেখি এক-পাল ছেলেমেয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ফুলের তোড়া হাতে অপেক্ষা করছে। এত রাত্তিরে আমরাই ঘুমের অভাবে বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম কিন্তু ওদের কোন কষ্টই হচ্ছিল না—একটি মুখেও অখুশীর ভাব দেখতে পেলাম না। হৈ-হৈ করে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। কথা ছিল হ্যাংচাও-এ তুদিন বিশ্রাম নিয়ে ক্যাণ্টনে গিয়ে আমরা আবার অনুষ্ঠান করবো।

কিন্তু আমাদের শিল্পীরা দাবি করে বসলেন, হ্যাংচাও-এও তাঁদের একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা চাই। ওখানকার শান্তি কমিটি আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সব ব্যবস্থা সেই দিনই করে ফেললেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান হোল।

আমাদের হোটেলটি ছিল বিরাট শি হু (West Lake)-'লেকের' ধারে—লেকটি অপূর্ব—দ্বিতীয় রাত্তিরে হঠাৎ ঝড় উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি; সারারাত ধরে ঝড়ের দাপাদাপি—অনেকদিন পর ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে ভারী আরাম লাগলো—প্রচণ্ড হাওয়ায় জানালাগুলির দুমদাম আওয়াজে ভোরের দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজা খুলে একটা বেতের আরাম কেদারা পেতে লেকের ধারে বসে পড়লাম। সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি বোঝার উপায় নেই, কারণ আকাশটা মেঘলা। ঝড়ের বেগ কিছুটা কমেছে, কিন্তু হাওয়ার মাতামাতি তখনো চলছে। প্রায় প্রতি আধ-মিনিট অন্তর হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়ার ঢেউ বিদ্যুৎবেগে লেকের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সরু একটা জলের ঢেউ হাওয়াটাকে যেন ধরবে বলে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছিল। এই হাওয়া আর ঢেউ-এর খেলা দেখতে দেখতে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। মাঝে মাঝে হোটেলের কর্মচারীরা গরম গরম কফি দিয়ে যাচ্ছিল। এলোমেলো ঝড়ের হাওয়া, মেঘলা আকাশ, সারিবাঁধা পাহাড়ের গা বেয়ে লেকের জলের ঢেউ—সবটা মিলে একটা অপরূপ শোভা—এমন শোভা আমি কখনো দেখিনি। চীন দেশে যে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি ভোরবেলা কাটিয়েছি তার মধ্যে ওই দিনকার ভোরবেলাটাই আমার সব চাইতে বেশি ভাল লেগেছে এবং ঐ ভোরবেলার কথাটি অনেকদিন মনে থাকবে।

একদিন একটা 'পার্ক' দেখতে গিয়েছিলাম। 'পার্ক' তৈরি করার কাজ তখনো শেষ হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে সাঁতার শেখবার জন্য একটি অদ্ভুত সুন্দর 'সুইমিং পুল' তৈরি হ'য়ে গেছে। ছোট একটা লেকের মতো জলাশয় করা হয়েছে, তার মধ্যে ছেলেমেয়েরা নৌকো

চড়ছে। পার্কের একধারে ছোট মত একটি চিড়িয়াখানা। তাতে নানাধরনের পাখী, হাঁস, মুরগী, সাপ, শেয়াল নেকড়ে, চিতা ও বাঁদর রেখে দেওয়া হ'য়েছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখতে এসেছে। বেশির ভাগই স্কুলের পড়ুয়া। ওরা সব চড়ুইভাতি করতে এসেছে। এক জায়গায় দেখি শ'দুই ছেলেমেয়ে চীনেমাটির বাটি আর দুটো কাঠি হাতে লাইন ক'রে একটা ঘরের দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তখন খাওয়ার সময় হয়েছে। ওরা সব যে স্কুলের ছাত্র সেই স্কুলের কমিটির খরচেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। পার্কটি দেখা হয়ে গেলে বাসে ওঠবার আগে লক্ষ্য ক'রে দেখি একটু দূরে রাস্তার ওপারে একটা অদ্ভুত ধরনের বাড়ি। শুনলাম বাড়িটা উন্মুক্ত প্রেক্ষাগারের মঞ্চ (Open Air Stage)—শুনেই বললাম, 'ওটা দেখব।' নির্মাণকার্য তখনো শেষ হয়নি বলে প্রথমে ওদের একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু আমিও নাছোড়-বান্দা, তাই শেষ পর্যন্ত ভেতরে যাওয়া হ'ল। প্রকাণ্ড 'স্টেজ'—দুদিকে বড় বড় ঘরের লম্বা সারি—গ্রীনরুম, মেকআপ রুম, হিসাবে ঘরগুলি ব্যবহার করা হবে—বাইরে থেকে কয়েক শো স্কুলের ছেলেমেয়ে এসে বাড়িটা দখল করে আছে—ওরাও এসেছে পিক্‌নিক্ করতে। সামনে ষাট হাজার দর্শকের আসনের ব্যবস্থা আছে। স্টেজের পেছন দিকের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো—ওদেশের একটি গানের প্রথম লাইনটি ছবি দেখতে দেখতে গুন্‌গুন্ করে ভাঁজছিলাম—হঠাৎ শুনি আমার পেছনে বিরাট এক কোরাস দল সেই গানটিই গাইছে—ঘুরে দেখি ৫০।৬০টি ছেলেমেয়ে হাততালি বাজিয়ে প্রাণের আনন্দে গান ধরেছে—এক ধরনে সবাই গাইছে—সুরে ও তালে কোনও বৈষম্য নেই—এক সূত্রে গাঁথা ভাবটি এখন থেকেই তৈরি হ'য়ে যাচ্ছে।

১৭ই অগাস্ট রাত সাড়ে-দশটায় রওনা হলাম ক্যান্টন অভিমুখে। সারারাত গাড়ি চলবার পর, পরের দিন সকাল বেলা 'শাই ইয়াও' স্টেশনে গাড়িটা থেমে গেল। শুনলাম লাইন খারাপ তাই একটু দেরি হবে। সারাদিন ওখানে আটকে রইলাম—ভাগ্যিস আকাশটা মেঘলা ছিল তাই রক্ষে। রাত্তিরে জানা গেল প্রায় এক'শো মাইল রেল লাইন প্রবল ঝড়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে। আবার হ্যাংচাও ফিরে যেতে হ'ল। ঠিক হ'ল অন্য পথ দিয়ে যাওয়া হবে। একদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা ওঁরা করে ফেললেন, পরদিন অর্থাৎ ২০শে অগাস্ট সকালে আবার ট্রেনে উঠলাম, ২৩শে অগাস্ট সন্ধ্যায় ক্যান্টনে পৌঁছে গেলাম। হংকং থেকে ২৫ তারিখে দেশে ফিরবার কথা ছিল। তাই কথাকলি নাচের দল, কলিমুল্লা খান ও আমি সেই রাত্তিরেই আবার ট্রেনে উঠলাম—বাকি সব রয়ে গেলেন ক্যান্টনে একটি অনুষ্ঠান দেখাবার জন্যে। ভোর বেলা ওদের শেষ স্টেশন 'শুং শুং'এ পৌঁছে বিদায় নেবার পালা। কয়েকজন দোভাষী আমাদের সঙ্গে এসেছেন। ওঁদের মুখের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না। পাসপোর্ট এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল—চুপচাপ একটি বেঞ্চিতে বসেছিলাম, কে একজন এসে পাশে বসলেন—আড়চোখে দেখে নিলাম কে অ্যান্ লীন্ নামে

একটি মেয়ে। কারো মুখে কথা নেই—খানিকক্ষণ বাদে জোর করে বললাম—'অ্যানি, আমি খুব দুঃখিত, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিনা—কিছু মনে কোরোনা'—গলার আওয়াজটা এমন হয়ে গেলো যে আমি নিজেই শুনতে পারছিলাম না। জবাবে অ্যান লীন ক্ষীণ স্বরে বললেন—'মিঃ বিশ্বাস, আমি সব বুঝতে পারছি।' শেষ পর্যন্ত কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে বিদায় নিলাম।

হংকং এসে শুনলাম, ২৫ তারিখের প্লেন কলকাতা থামবে না। তাই সেদিন আমার যাওয়া হ'ল না—কথাকলির দল অবশ্যি চলে গেল। ২৫শে বিকালে ক্যান্টন থেকে দলের সবাই পৌঁছে গেলেন। রাত্তিরে পিকিং শান্তি কমিটির একজন নেতা মিঃ হু-চুন-পুকে চিঠি লিখছিলাম। হঠাৎ বিলায়েৎ উত্তেজিত ভাবে এসে বললে, 'দাদা—হাম অ্যায়সা কভি নেহি দেখা'। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হোলো?' আধো-বাংলা আধো-হিন্দীতে মিশিয়ে ও বিদায়ের দৃশ্যের বর্ণনা শুরু করলো। অনেক জায়গায় ওকে যেতে হ'য়েছে—প্রত্যেক জায়গায়ই বিদায়ের ব্যাপারটা শুধু মামুলী ধরনের কৃত্রিম হাসি আর করমর্দনের মধ্যেই শেষ হ'য়ে যায়। শুং শুং থেকে বিদায় নেবার সময় যা কাণ্ড ঘটে গেল, ওর জীবনে এমনটি আর কখনো হয়নি। মানুষের প্রতি মানুষের এমন মমতা, ভালবাসা সে কোথাও দেখেনি। হু-চুন্-পু থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকটি কর্মীকে জড়িয়ে ধরে কোন কথাই সে বলতে পারে নি—বারে বারে চেষ্টা করেছে কিছু বলতে, কিন্তু দু'পক্ষেরই হাউ-হাউ কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজই গলা দিয়ে বেরোয়নি। খুব উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল—ওর দু'চোখে জল—হঠাৎ ও বললে—'জানো দাদা—তুমি ক্যান্টন ছেড়ে আসার পর দোভাষীরা কী যে মনমরা হ'য়ে পড়েছিল তা কী বলবো!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তুমি থামো।' বিলায়েৎ আরও জোরে জবাব দিল—'আমি থামব না—দেশে ফিরে গিয়ে আমার জানা অজানা

সবাইকে বলবো চীনবাসীর ভালবাসার কথা—ওরা সত্যি সত্যি শান্তি চায় বলেই বিদেশীকে এমন আপন করে নিতে পারে। যে স্নেহ মমতা ও আদর পেয়েছি তার তুলনা নেই—দেশবাসীর কাছে যদি এসব কথা না বলি তাহ'লে আমার পাপ হবে।' হৃদয়ের আবেগ ও কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না—অনর্গল ব'লে যাচ্ছিল। ও কিছুতেই থামবে না দেখে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলাম।

২৭শে অগাস্ট হংকং থেকে আমাদের প্লেন ছাড়লো—সবাই ছোট খাটো ঘটনার উল্লেখ করে চীনের কর্মীদের হৃদয়ের পরিচয় দিতে লাগলেন। বিকালের দিকে প্লেনটা প্রায় ব্যাংককের কাছাকাছি এসেছে—মাদ্রাজের মৃদঙ্গবাদক মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি একদৃষ্টে কাঁচের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন—গাল বেয়ে জল ঝরছে—কোলে তাঁর চীনের ডায়ারিটি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।